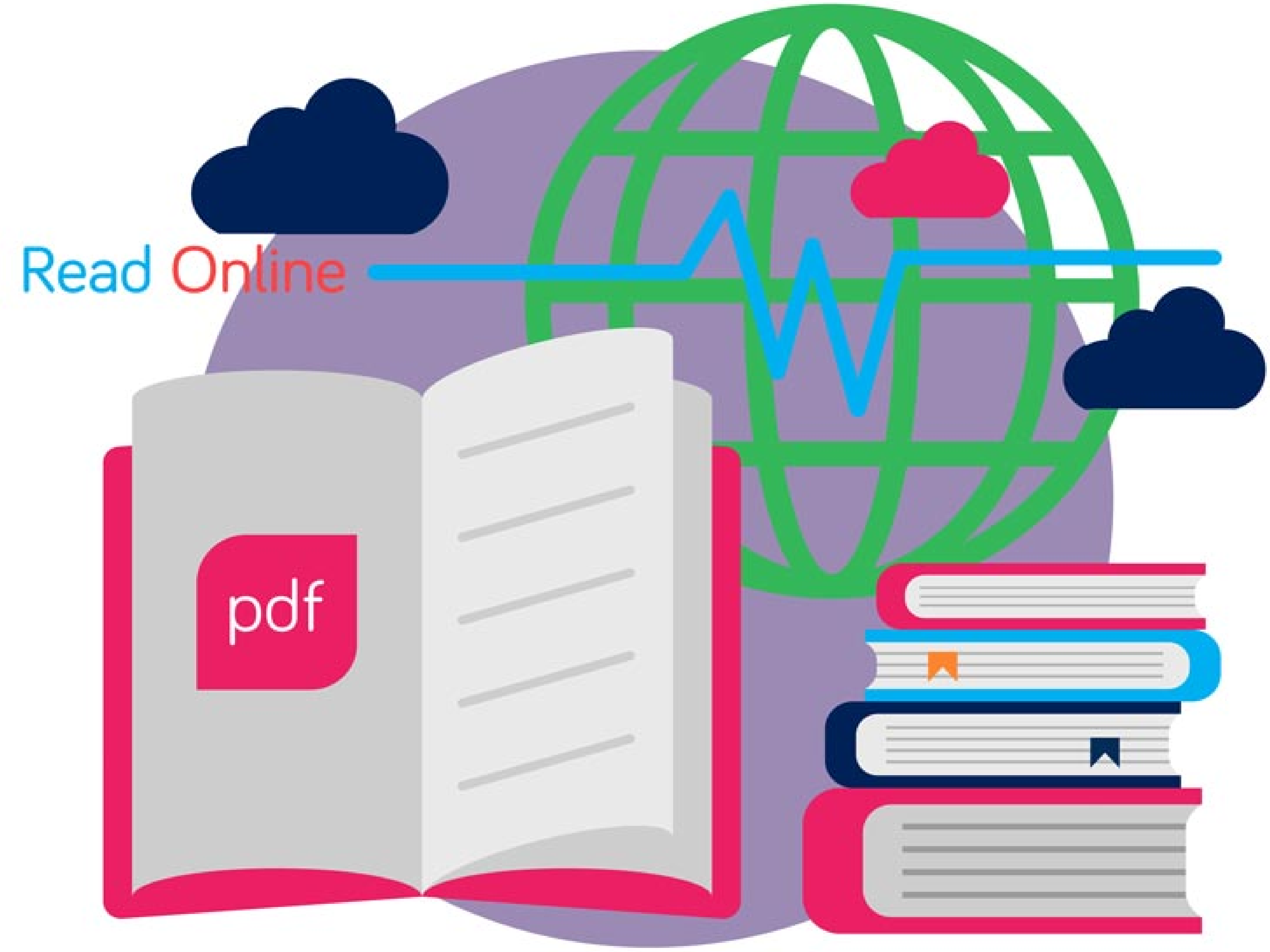

Read Online
pdf


সেঁজুতি, তোমার জন্য
আনিসুল হক
BD eBooks
Free Bangla Books Download

সেঁজুতি কাজ করে ঢাকার একটা মেগা শপে। দোকানের নাম টেন টু টেন। বোঝাই যাচ্ছে এই দোকান দিনের মধ্যে ১২ ঘণ্টা খোলা থাকে। বিশাল জায়গা জুড়ে এই বিপনীবিতান। এখানে মোটামুটি একটু উঁচু দরের জিনিস পাওয়া যায়। দোকানের খদ্দেররা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত। বেশির ভাগই তরুণ-তরুণী। সিডি, ডিভিডি, বই, পারফিউম, ঘড়ি, মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে বিদেশি বড় ব্রান্ডের শার্ট টি শার্ট জামা জুতা নানা ধরনের জিনিসপাতির সমাহার এখানে। এক কোণে একটা কফিশপ, আরেক কোণে আইসক্রিম পারলার।

সেঁজুতি এই টেন টু টেনের একজন কর্মী। তার পরনে দোকানের নির্দিষ্ট পোশাক। লালকালো ঘন স্ট্রাইপের জামা, কালো প্যান্ট, তার ওপরে ছাই রঙের অ্যাপ্রন। বুকে নামফলক-- সেঁজুতি রহমান। আসলে সে বিক্রয়কর্মী নয়। সে জিনিসপাতির হিসেবনিকেশ রাখে। কী কী জিনিস শেষ হয়ে গেছে, সেটা সে দেখে আর টুকে রাখে। আর জায়গার জিনিস জায়গার তাকে সাজিয়ে রাখাটাও তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

তার কানে গান শোনার যন্ত্র, এমপি থ্রি প্লেয়ারের ইয়ারফোন। এই প্লেয়ারগুলো এখন সস্তা হয়ে গেছে। দামে সস্তা, কিন্তু ভেতরে গান থাকে অনেক।

তার কানে গান বাজছে। দলছুটের গান বাজছে এখন। গানটা ভালো। বাপ্পা বেশ ভালো গায়। আর গানের কথাগুলো কত ভালো। তুমি আমার বায়ান্ন তাস, শেষ মুদ্রায়ও রাজি, তোমার জন্যে ধরেছি আমার সর্বস্ব বাজি। সেঁজুতি কাজ করছে আর গান শুনছে। গানের তালে তালে তার মাথাটা একটু এ পাশ ও পাশ করছে। পায়ের মধ্যেও খানিকটা দোলা। দেখে মনে হচ্ছে সে নেচে নেচে কাজ করছে। তার মনে আনন্দ।

প্রত্যেকটা তাকে জিনিসপাতি শেষ হয়ে গেলে সে লিখছে। তার এই নোট সে জমা দেবে ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার সেটা পাঠাবেন পারচেজ বিভাগের কাছে। পারচেজ বিভাগ জিনিসপাতি কিনে আজকের মধ্যেই দোকানে নামিয়ে দেবে।

সেঁজুতি এখন বইয়ের তাকে বইগুলো ঠিক করে রাখছে। বই থাকবে লেখকের নাম অনুসারে, আর লেখকের নাম থাকবে বর্ণানুক্রমে। খদ্দেররা সাধারণত বই নামায় দেখার জন্যে, কিন্তু রাখার সময় ঠিক জায়গায় রাখতে পারে না। পারার কোনো কারণই নাই।

এই দোকানের (দোকান কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে, মেগা শপিং সেন্টার বললে ভালো শোনায়) আরেকজন কর্মী রত্না। তারও একই রকমের পোশাক। তারও বুকে নামফলক। রত্না এগিয়ে আসে সেঁজুতির কাছে। বলে, কানে এইটা কী? সেঁজুতি শুনতে পায় না। রত্নার কথা নয়, তার কানে বাজে দলছুটের আরেকটা গান, সাদা ময়লা রঙিলা পালে...

রত্না তার আরো কাছে যায়, এই, ডিউটির সময় এইটা কানে কী?

সেঁজুতি মেয়েটা প্রচন্ড হাসিখুশি। সে এক কান থেকে ইয়ারফোনটা নামিয়ে হাসিভরা মুখে বলে, কিছু বললা? সেঁজুতির গায়ের রংটা যাকে বলে শ্যামলা, তবে তার চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টতা আছে, হাসলে মনে হয় মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ রেখা খেলে গেল।

রত্না মেয়েটা ফর্সা, অনেকটা ময়দা ছেনে রাখলে যে রকম দেখায়, তাকে দেখায় সেই রকম, তবে তার মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায়, সহজেই তার চোখমুখ লাল বা কালো হয়ে ওঠে, এখন যেমন সে রক্তিমাভা মুখমন্ডলে ফুটিয়ে বলে, শোনো। এইটা কাজের জায়গা। এইটা তো পিকনিক করার জায়গা না। কানে এইটা দিয়া তো কিছুই শুনতে পাও না। আবার বলে, কিছু বললা। খোলো এইটা।

সেঁজুতি বলে, আরি কী মজার গান। শোনো না। এইটা কানে দিয়ে শোনো। আনুশেহর গান হচ্ছে, নামাজ আমার হইল না আদায়।

রত্না বলে, এইটা কানে দিলে ক্লায়েন্ট কিছু বললে শুনতে পাব?

সেঁজুতি বলে, এত সুন্দর গান রেখে ক্লায়েন্টের কথা শোনার দরকার কী? বলে আবার সেঁজুতি তার বিখ্যাত ট্রেডমার্ক হাসিটা দেয়। রত্না বিরক্ত হয়ে চলে যায় অন্য দিকে। সেঁজুতি আবার নিজের কাজ করতে থাকে।

দুইকানেই ইয়ার ফোন পরলে মিউজিকের সাউন্ড বেড়ে যায়। এবার শুরু হলো নতুন গান।

পারে লয়ে যাও আমায়। লালনের গান। ব্যান্ডের তালে।

রত্নার পিত্তি জ্বলছে। এর একটা বিহিত করা দরকার। কানে গানের যন্ত্র দিয়ে কেউ শপিং সেন্টারে কাজ করতে পারে না। তার চোখ-কান সব সময়

খোলা থাকতে হবে। এই সেঁজুতি মেয়েটা নতুন। নিয়ম-কানুন জানে কম, কিন্তু ভাব দেখায় বেশি। রত্না সেন্টারটির সুপারভাইজারের কাছে যায়, তিনি একটা কাচ ঘেরা করে বসে মাথা নিচু করে কাজ করে চলেছেন।

রত্না টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলে, স্যার...

সুপারভাইজার সাহেব গোলগাল মানুষ। ছোটখাটো গোলগাল মানুষকে সাধারণত ভালো মানুষ বলে মনে হয়। কী রত্না? তিনি মুখটা একবার তুলে আবার নামিয়ে নিয়ে বলেন।

রত্না টেবিলের এককোণা নখ দিয়ে খুটতে খুটতে বলে, স্যার। ওই যে নতুন মেয়েটা...

সুপারভাইজার মুখ তোলেন, কোন নতুন মেয়েটা?

রত্না বলে, ওই যে স্যার শাহজালাল ইউনিভার্সিটি থেকে যেইটা আসছে...

কী করছে?

রত্না গড়গড়িয়ে বলে, স্যার ও একটা বেয়াদব। কোনো কথা শোনে না। কানের মধ্যে একটা হেডফোন লাগায়া সারাক্ষণ গান শুনতেছে। আমি কী বলি কিচ্ছু শুনতে পায় না। শোনার ইচ্ছা নাই, কাজ ফাঁকি দেওয়া হইল মতলবটা। ক্লায়েন্ট যদি একটা কিছু বলে বসে যাতে খাটতে না হয়। সেই জন্যে কানে ওইটা দিয়ে রাখছে।

সুপারভাইজার হাসিমুখে বলেন, নিষেধ করো।

'স্যার করছিলাম। পাত্তাই দিল না। স্যার এরপরে যদি স্যার আপনারা একশন না নেন...

সুপারভাইজার মুখে আরেক পশলা হাসি ফুটিয়ে বলেন, ঠিক আছে আমি দেখতেছি...

সুপারভাইজারের মুখের হাসি দেখে রত্নার মুখের আলো নিভে যায়, এই লোক ফাজিল মেয়েটাকে কিছুই বলতে পারবে না।

সেঁজুতির কানের ইয়ার ফোনের সাউন্ড বক্সে গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে। তার মানে তার মোবাইল ফোনে কল আসবে। সে মোবাইল ফোনের রিংগার নীরব করে রেখেছে। তবে মুঠোফোনের ভাইব্রেটর চালু আছে। সে এপ্রনের পকেট থেকে মোবাইল ফোন করে হাতে নেয়। দেখে কে ফোন করেছে। কে আর ফোন করবে। শিশিরই করেছে।

শিশির কাজ করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মোবাইল লাইব্রেরিতে। গাড়ি ভরা বই। নানা জাতের বই। যেন এক গাড়ি আলো। এক গাড়ি মানুষের হাসি-কান্না,

স্বপ্ন আর ভগ্নস্বপ্ন, সভ্যতার ইতিহাস আর ভবিষ্যত, এক গাড়ি মহাসমুদ্রের স্তব্ধ কল্লোল।

শিশির সেই রকম একটা গাড়ির কর্মী। গাড়ির সঙ্গে সে ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় যায়। তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের আকর্ষণ করে। তাদের নিয়ে গ্রুপ বানায়। মাসের শেষে সেই গ্রুপের সবাই একবার করে বসে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে।

সেঁজুতি তার মুঠোফোনে আসা শিশিরের কলটা কেটে দেয়। তারপর চলে যায় তাদের স্টাফ রুমে। এখানে সবার ব্যক্তিগত জিনিসপাতি থাকে। তারা এপ্রন পরে, খুলে রাখে এই জায়গাতেই। আবার যার যার দুপুরের খাবার বা বিকালের চাও তারা সারে এই জায়গাতে। সে শিশিরের মোবাইল কল দেয়।

শিশির ফোন ধরে বলে, এই কী করো।

সেঁজুতি একটু উষ্মা মেশানো কণ্ঠে বলে, কী? তোমাকে না বলছি আমার কাজের সময় রিং করবা না?

শিশির বলে, আরে তোমার কথা মনে হইল। তোমার কথা মনে হইলে আমি কী করব।

এই জন্যে ফোন করছ?

তোমার ডিউটি কয়টায় শেষ।

৫ টায়।

৫টায়। আচ্ছা তুমি তাইলে দেরি করবা না। ঠিক ৫টায় বার হও।

না পারব না। বের হতে হতে ৫টা বিশটিশ বেজে যাবে।

আচ্ছা সোয়া ৫টা।

কেন?

তারপর তোমাকে নিয়া একটু বার হবো।

কই যাবা?

একটু গ্যেটে ইন্সিটিটিউটে যাব। একটা ছবি দেখাবে। জহির রায়হান ফিল্ম সোসাইটি। যুদ্ধবিরোধী ছবি। ক্রেনস আর ফ্লাইং হবে আজকা। যাবা?

টিভিতে দেখছি।

আরে দেখলেও অসুবিধা কী। দুইজন থাকলাম পাশাপাশি এসির মধ্যে বসে দুই ঘন্টা।

আমি সারাক্ষণই এসিতে বসে থাকি শিশির।

আরে তুমি তো থাকোই। আমি তো থাকি না। আমি এখন আমগাছের নিচে ঘামতেছি।

তাই নাকি? এই আমগাছে মুকুল আসছে।

মুকুল তো আসছেই। গাছে কোকিলও ডাকতেছে।

ইস। বাইরে বসন্ত এসে গেছে। আর এই শপিং সেন্টারে আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না।

এই জন্যেই বলি আমার সাথে বার হও। ঠিক আছে তাইলে। আমি অগ্রিম টিকিট কেটে রাখলাম।

বসন্ত দেখতেও কি টিকিট লাগে নাকি?

আরে বসন্ত দেখতে না। ছবি দেখতে। ঠিক আছে?

আচ্ছা ঠিক আছে রাখি। কাজের সময় ক্যানো যে ফোন করো। সেঁজুতি তাড়াহুড়া করে ফোন রেখে দেয়। কারণ রত্না এসে গেছে এই ঘরে। তার সামনে মোবাইলে কথা বলা মানে ধরা খাওয়া।

রত্না আবার যায় সুপারভাইজারের সামনে–স্যার।

সুপারভাইজার বলেন, কী রত্না বলো।

স্যার ওই শাহজালাইলা হাফ এন আওয়ার ধরে নাই। আমি ফলো করে গেলাম... স্টাফ রুমে গিয়া দেখি স্যার মোবাইলে কথা বলতেছে। স্যার এই রকম করলে তো স্যার চলবে না। আপনি স্যার কিছুই করবেন না?

অবশ্যই করব। আমি অবশ্যই একশনে যাবো।

আপনারা তো স্যার চেহারা দেখে সব ভুলে যান। দেখতে টেখতে সুন্দর আছে তো।

এইটা রত্না তুমি কী বললা। চেহারা দিয়ে আমি কী করব।

তাইলে স্যার সেঁজুতির চাকরি থাকে কী করে।

এই সময় সেঁজুতি এসে উঁকি দেয়।

রত্না চুপ করে যায়।

সুপারভাইজার হাসিমুখে বলেন, কী খবর। সেঁজুতি আসো।

রত্না বলে, আমি আসি স্যার। সে সুপারভাইজারের চোখে চোখ রেখে ইশারা করে, যার অর্থ, আমার কথা কিছু যেন বইলেন না।

সুপারভাইজার তার কথার মানে পড়তে পারেন বলে মনে হয়। তিনি ইশারা করেন, যার অর্থ, আচ্ছা যাও। তোমার কথা বলব না।

সেঁজুতি বলে, স্যার আমাকে আজকে স্যার একটু তাড়াতাড়ি ছাড়া যাবে?

সুপারভাইজার হাসিমুখে বলেন, কেন?

স্যার একটা ফোন আসছিল। মানে স্যার, আমার তো নিগেটিভ রক্ত।

মানে?

মানে স্যার আমার ব্লাডের গ্রুপ এবি নিগেটিভ। নিগেটিভ গ্রুপ মানেই হলো রেয়ার গ্রুপ। এই গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায় না। আমরা স্যার যারা নিগেটিভ গ্রুপ তারা স্যার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখি। ওয়েব পেজে আমাদের নাম ফোন নাম্বার সব এন্ট্রি করা আছে। তো স্যার একজনের ব্লাড লাগলে স্যার আরেকজন এগিয়ে আসে।

আচ্ছা।

স্যার একটা ফোন আসছে। একটা স্যার বাচ্চা ছেলে। ওর একটা অপারেশন হবে। ব্লাড দরকার। আমি স্যার ব্লাডটা দিতে যাবো। আমাকে যদি স্যার আজকে ৫ টার আগে ছাড়েন।

সুপারভাইজার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলেন, প্রায়ই তুমি রক্ত দাও নাকি!

প্রায়ই না। ছয় মাসে একবার তো দেওয়া হয়ই।

ছয় মাসে একবার। তোমার নিজেরই তো ব্লাড নাই।

আছে স্যার। ৫০ কেজি ওজন হলেই ব্লাড দেওয়া যায়। আমার ওজন আছে স্যার।

কতজনকে দিছ তুমি ব্লাড। এই পর্যন্ত।

৬/৭ জন হবে।

কী বলো...

আমি কি স্যার তাহলে আজকে একটু আগে বের হবো?

তুমি যে কারণ দেখালা... আচ্ছা যাও....

থ্যাংক ইউ স্যার।

সেঁজুতি ওঠে। তার চেহারার মধ্যে আসলেই একটা মায়া মায়া ভাব আছে। রত্না মেয়েটা ভুল বলে নাই। সেঁজুতি মেয়েটার চেহারা ভালো।

সেঁজুতি বেরিয়ে যায়। সুপারভাইজার নিজের কাজে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই রুমে আবার রত্না ঢুকে পড়ে।

রত্না বলে, স্যার ওকে স্যার বকে দিছেন তো স্যার।

সুপারভাইজারের মুখের হাসি অম্লান, কাকে?

আবার কাকে। ওই শাহজালাইলাটাকে।

মানে। সেঁজুতিকে? হ্যাঁ। বলছি। কড়া করে শাসন করে দিয়েছি। এইটা তো একটা প্রতিষ্ঠান। তাই না। এর কিছু নিয়মকানুন আছে। তাই না?

এই রকম হাসি হাসি মুখ করে বলছেন নাকি স্যা?

শোনো আমি কিন্তু হাসি না। আমার মুখটার একটা ডিফেক্ট আছে। আমাকে হাসি হাসি দেখায়। আসলে আমি কিন্তু সব সময় হাসি না।

সেঁজুতি আড়ালে গিয়ে ফোন করে শিশিরকে। এই শিশির। পোনে ৫টার মধ্যে আমাদের মার্কেটের সামনে আসবা।

শিশির বলে, পোনে ৫টায়। আগাইলা সময়টা।

হুঁ।

অ্যাচ্ছা আমি আসতেছি।

রাখি।

খালি রাখি রাখি করো ক্যানো?

আরে আমার এইটা কাজের জায়গা না।

কাজের জায়গায় কাজও করবা। ফোনও করবা। তুমি এমপি থ্রির ইয়ারফোনের বদলে একটা এমপি থ্রি অলা মোবাইল সেট কিনো। গান শুনতে শুনতে কথা বলবা। কেউ টের পাবে না। আর হাত থাকবে ফ্রি। তোমার কাজ তো জিনিসপাতি সাজানো আর কী কী নাই সেইটা লেখা। ওইটা করতে করতে মোবাইল ফোন খুব ধরা যায়।

এত কথা বইলো না তো! রাখো।

আচ্ছা তুমি রাখো।

তুমি রাখো!

তুমি।

তুমি। বলে সেঁজুতিই ফোনটা কেটে দেয়।



ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে টেন টু টেন দোকান তথা মেগা শপিং সেন্টারটা। শিশির সেই বিপনী বিতানের সামনের ফুটপাতে পায়চারি করছে। বেশ গরম পড়েছে আজ। বসন্তের বিখ্যাত বাতাসেও শরীর জুড়াচ্ছে না। শিশিরের গায়ের টিশার্ট ঘেমে একাকার। সে পরেছে কালো রঙের টি-শার্ট। এটাই এখন ফ্যাশন। বোধ হয় ময়লা যাতে বোঝা না যায় সেই কারণে ছেলেরা কালো টিশার্ট পরে থাকে। তার পরনের জিনসটা অবশ্য রংচটা। এটাও এখনকার ফ্যাশন। শিশির ছেলেটার গায়ের রংও মোটামুটি কালোই, ভদ্র ভাষায় শ্যামলা বললে ভদ্রতাই হয়, সত্য রক্ষা হয় না।

তবে ছেলেটা লম্বা। চুলগুলো কোকড়া কোকড়া। একহারা গড়ন। সে এরই মধ্যে দুইবার মিসকল দিয়েছে সেঁজুতিকে। সেঁজুতি কোনো জবাব দেয় নাই।

২৯ নম্বর সড়কে আজকে বেজায় যানজট। ফুটপাথে দাঁড়ানোও মুশকিল। মানুষ হাঁটেও এইসব রাস্তায়। শিশির একবার মোবাইল হাতে নিয়ে সময় দেখে নেয়। হাতে কোনো ঘড়ি নাই। ঘড়ি দেখার জন্যে এখন মোবাইল ফোনের সেটই যথেষ্ট।

সেঁজুতি বের হয়। শপিং সেন্টারের পোশাক পাল্টে এসেছে সে। এইবার তাকে দেখাচ্ছে অন্য রকম। খয়েরি রঙের কামিজ, কালো রঙের সালোয়ার। চুলগুলোও খুলে দিয়েছে সে। বেরিয়ে সে শিশিরের মোবাইলে মিসকল দেয়।

শিশির জনারণ্যে মিশে ছিল। তার মিসকল বাজলে সে মোবাইলে তাকিয়ে এদিক ওদিক দেখে। তারপর সেঁজুতিকে খুঁজে পেয়ে এগিয়ে আসে।

সেঁজুতির কাছে এসে বলে, চলো। তাড়াতাড়ি বেরোনোয় ভালোই হইল। আমরা সোবহানবাগে গিয়া একটু সিডির দোকানে ঘুরব। তারপর খাবারের দোকানে বসে দুইজনে দুইটা মুরগি ভাজা খাব।

সেঁজুতি বলে, শিশির। তোমাকে বলা হয় নাই। একটা বাচ্চা ছেলের অপারেশন। আমি ওকে ব্লাড দিতে যাবো।

কখন?

ইমার্জেন্সি অপারেশন। এখনই যাবো।

এখন কীভাবে রক্ত দিবা। সারাদিন খাটলা না?

আরে ব্লাড দেওয়া কোনো ব্যাপারই না। আমি অনেক দিছি। চলো চলো।

আমার সিনেমা? পকেটে টিকেট।

চলো তো। তাড়াতাড়ি ব্লাডটা দিয়া সিনেমা হলে ঢুকে পড়ব। ছয়টায় তো শো। তাই না।

শিশির হতাশ ভঙ্গিতে বলে, এইটা কোনো কথা হইল। তোমারে পাওয়াই যায় না। আমার সময় মেলে তো তোমার মেলে না। তোমার মেলে তো আমার মেলে না। পরে ব্লাড দিও।

ইটস আ কোশ্চেন অফ লাইফ এন্ড ডেথ। তুমি জানো না আমরা নিগেটিভ ব্লাড ওয়ালারা একটু ব্লাডের জন্যে কত সাফার করি। চলো। আজকে আমি যদি অন্যের বিপদে না যাই, কালকে আমার বিপদে কেউ আগায়া আসবে না। চলো তো। সেঁজুতি শিশিরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় একটা খালি রিকশার দিকে। এই রিকশা যাবেন?

গোটা দুয়েক রিকশাওয়ালা যেতে রাজি হয় না। তিন নম্বরটা রাজি হলে তারা উঠে পড়ে রিকশায়।

দুজনে পাশাপাশি বসা। সেঁজুতি তার এমপি থ্রি প্লেয়ারের ইয়ার ফোনের একটা শিশিরের কানে ঢুকিয়ে দেয়। আরেকটা সে পরে নেয় নিজের কানে। আর গান বাজতে থাকে:

থাকতে যদি না পাই তোমায়, চাই না মরিলে,

ভালোবাসি বলে রে বন্ধু আমায় কাঁদালে।

রিকশা চলতে থাকে।

কী করলা সারাদিন? সেঁজুতি বলে।

কিছুই করি নাই। শিশির একহাতে চুল ঠিক করতে করতে জবাব দেয়।

কিছুই করলা না? তোমাদের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কই গেছল আজকে?

ইস্কাটন গার্ডেনের কোয়ার্টারগুলোর সামনে।

আসছিল কেউ বই নিতে?

হ্যাঁ। আসবে না কেন। অনেকেই আসছিল।

কোনো মেয়ে আসে নাই?

মেয়েরাই তো বেশি আসে।

সুন্দরী মেয়ে কেউ আসছিল?

সব মেয়েকেই তো আমার কাছে সুন্দর লাগে।

না মানে বিশেষ রকমের কোনো সুন্দরী কেউ আসে নাই?

বিশেষ রকমের সুন্দরী মানে কী?

মানে ভেরি স্পেশাল টাইপ কেউ।

হ্যাঁ।

কী রকম?

একজন আসছিল খুব মোটা। একজন আসছিল ধরো মাথায় টাক। তুমি এর আগে কোনো মেয়ের মাথায় টাক দেখছ?

ধেত্তেরি। এইসব না।

কী সব?

খুব সুন্দরী।

খুব সুন্দরী?

হ্যাঁ।

তোমার মতো?

আরে আমি আবার সুন্দরী নাকি?

কেন আয়না দেখে আসো নাই বাইরানোর আগে!

দেখছি বলেই তো বলতেছি।

আমার মুখে আরেকবার শুনতে চাও। তোমরা মেয়েরা যে কি না! খালি চাও লোকে বলুক আমি সুন্দরী আমি সুন্দরী।

এই তোমাকে ধাক্কা দিয়া রিকশা থেকে ফেলে দিব।

আমাকে রিকশা থেকে ফেলে দিবা?

হ্যাঁ।

তাইলে জানো রাস্তাটা কী রকম ব্যথা পাবে?

আরে লোকটা তো ইয়ারকি করেই যাচ্ছে।

ইয়ারকি করব না? আচ্ছা তাইলে রাগ করি। আমার এই মূল্যবান বিকালবেলায় যখন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কাজ ফাঁকি দিয়া আমি তোমার পাশে বসায়মান, তখন তুমি আমার সাথে সিনেমা দেখতে না গিয়া যাইতেছ ব্লাড ডোনেট করতে। মানেটা কী?

বসায়মান না কী কইলা? এইটার মানে কী?

মানে উপবিষ্ট আর কী! বাদ দাও। সিরিয়াস কথা বলছি। সিরিয়াসলি জবাব দাও।

এই যে আমার ক্লিনিক এসে গেছে। নামো। রিকশাভাড়া দাও।

আমি দিব? এমনিতেই আজকের টিকেটের দাম ২০ টাকা করে। তুমি জানো? ৪০ টাকা শুধু টিকেটের পেছনেই গেছে।

আচ্ছা আচ্ছা বাবা দিতে হবে না। আমিই দিতেছি। সেঁজুতি ব্যাগে হাত দেয়।

রিকশাওয়ালা ভাই নিয়েন না। আমার টাকাটা নতুন চকচকা। শিশির পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলে।

সেঁজুতি টাকা বের করে ফেলেছে, তার টাকাট আসলেই নতুন, সে বলে, আমারটার মতোন চকচক্কা তোমারটা হইতেই পারে না। আমারটা শপিং সেন্টারের টাকা। আমরা রোজ ব্যাংক থেকে নতুন টাকা আনি।

শিশির রিকশাওয়ালাকে বলে, আচ্ছা তাইলে ওইটা নেন। নিয়া আমারটা সাথে বদলান। আপনি আমাকে দিলেন দশটাকা। তার বদলে আপনি পাইলেন দশটাকা। শোধবোধ। আমার রিকশাভাড়া দেওয়াও হইল আর দশটাকা পকেটে ফেরৎও আসল। বুঝলেন না?

রিকশাওয়ালা হাসে। টাকা তো আপাই দিল।



রত্না আবার সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। বলে, স্যার শুক্লাকে বলছেন কিছু।

সুপারভাইজার বলেন, হ্যাঁ।

হ্যাঁ কী স্যার। বলছেন কিছু!

শাসন করে দিলাম তো--সুপারভাইজারের মুখে হাসি।

রত্না বলে, কী শাসন করলেন। ও তো আজকে তাড়াতাড়ি চলে গেল। আর নিচে ওর বয়ফ্রেন্ড এসে বার বার মিসকল দিচ্ছিল। ও তো ৫টা না বাজতেই কাট... বোঝেন... এই রকম করলে যে কেমনে চলবে আপনারাই ভালো বুঝবেন...

সুপারভাইজার বললেন, না। এই রকম করলে চলবে না। তুমি একটু দেখো তো কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। আসলে তোমার মতো কর্মী আছে বলেই আমাদের এই বিজনেসটা ভালো চলছে। যাও কাজ করো কাজ করো।

রত্না মনে হয় খুশিই হয়। কিন্তু ওঠার আগে বলে, এই হয় স্যার, যে বেশি কাজ করে সবাই তাকেই খালি কাজ দেয়, যে করে না তাকে কেউ দেয় না।

না না সেটা ঠিক না, মানে তুমি যে কাজ করো সেটা তো আমরা এপ্রিশিয়েট করি। তাই না।

দেখা যাবে, কী এপ্রিশিয়েট করেন, বলে রত্না ওই কক্ষত্যাগ করে।



হাসপাতালটা তেমন সুবিধার না। শিশির ভাবে। আবাসিক ভবনকে হাসপাতাল বানিয়েছে। বাড়িটাও বেশ পুরোনো। ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগে। বাইরে বিকালের রোদ এখনও মরে নি কিন্তু রিসেপশনটাই কেমন অন্ধকার। ডেটল বা ফিনাইলের গন্ধও তো নাকে এসে লাগছে না।

হাসপাতালের রিসেপশনে দাঁড়িয়ে সেঁজুতি আবার মোবাইল ফোন বের করে। কল দেয়।

জি আমি সেঁজুতি, আমার আসার কথা ছিল ব্লাড ডোনেট করার জন্যে। আমি আসছি। রিসেপশনে দাঁড়ায়া আছি...আচ্ছা আচ্ছা আমরা আসতেছি।

সেঁজুতি ফোন রেখে রিসেপশনিস্ট মহিলাকে জিজ্ঞেস করে, ৩০৭ নম্বর কেবিন কোনটা?

তিন তলায় ডাইনে। মহিলা মাথা না তুলে বলেন। এই মহিলার মুখে অপুষ্টির ছাপ। সম্ভবত বিয়ে হচ্ছে না ধরনের হতাশাও চোখে-মুখে। শিশির ভাবে।

সেঁজুতি লম্বা পা ফেলে সিঁড়ির দিকে এগোয়। শিশির তাকে অনুসরণ করে। লিফট নাই নাকি? শিশির সিঁড়িতে বড়ো পা ফেলতে ফেলতে বলে।

সেঁজুতি বলে, আমি লিফট ভয় পাই। তিনতলা পর্যন্ত হাঁটতে কী লাগে?

শিশির বলে, কিছুই লাগে না। দুইটা পা লাগে।

৩০৭ নাম্বার কেবিনের সামনে দেখা গেল একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। তার বয়স বছর তিরিশেক, পরনে শাড়ি। তিনি আসেন আসেন বলে অভ্যর্থনা জানান। তারা ভেতরে যায়।

এইবার ফিনাইলের গন্ধ নাকে এসে লাগে।

দুটো বিছানা এক ঘরে।

একটায় একটা বছর ছয়-সাতেকের বাচ্চা শুয়ে আছে। তার হাতে স্যালাইনের সুচ ঢোকানো। মাথার ওপরে স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে।

সেঁজুতি বাচ্চাটার পাশে বসে। বলে, তোমার নাম কী?

বাচ্চাটা স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, শান্ত।

তুমি কি শান্ত নাকি দুষ্টু?

দুষ্টু।

কেন দুষ্টু কেন?

আমি যখনই কিছু চাই, আমার বাবা মা সাথে সাথে আমাকে দিয়ে দেয়। বাচ্চারা যখন কিছু চায়, সাথে সাথে দিতে হয় না। আধঘন্টা একঘন্টা পরে দিতে হয়। আমাকে সাথে সাথে দেয় তো এই জন্যে আমি দুষ্টু হয়ে গেছি।

সেঁজুতি হাসতে হাসতে বাঁচে না।

শিশির গম্ভীর।

সেঁজুতি বলে, তুমি শুনছ ও কী বলল?

শুনছি। শিশির আরও গম্ভীর।

শুনেও তুমি হাসলা না?

বা চাদের কথাতে হাসতে হয় না। ওরা খুব সত্য কথা সহজে বলে ফেলতে পারে। শিশির আরও গম্ভীর হয়ে যায়।

এই সময় একজন নার্স আসেন। তার পাও যেন চলছে না। আমাদের স্বাস্থ্যখাত রক্ষায় সেবিকাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক একটা রচনা লেখা দরকার। এই ক্ষীণস্বাস্থ্য হতোদ্যম বিরসবদন সেবিকাদের দিয়ে দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা হবে কী করে?

সিস্টার মুখ খোলেন। তার আওয়াজ অতি খনখনে। এই ভগ্নির জন্যে রোজ সকালে এক চামচ মধু আর বিকালে যষ্ঠিমধু চিবানোর ব্যবস্থা দেওয়া উচিত।

শিশিরের উদ্দেশেই সিস্টারের জিজ্ঞাসা, ব্লাড কে ডোনেট করবে? আপনি?

শিশির আত্মরক্ষার্থে মরিয়া। বলে, না আমি না। ও।

সেঁজুতি অকুতোভয়, বলে—আমি।

সিস্টার বলেন, আসেন।

সেঁজুতি বলে, ম্যাচ করে কিনা দেখবেন না?

সিস্টার বলেন, সেই জন্যেই তো ডাকতেছি...

সেঁজুতি বলে, শান্ত। তুমি একটা চমৎকার ছেলে। গুড বয় ছেলে। আমি আসতেছি এক্ষুনি। ঠিক আছ বাবু?

শান্ত বলে, ঠিক আছে।

সেঁজুতি আর নার্স বেরিয়ে যায়। শিশিরও কর্তব্যজ্ঞানে স্থির থাকতে পারে না। সেও সেঁজুতির পিছু নেয়।

তারা ব্লাডব্যাংক লেখা একটা ঘরে যায়। এই ব্যাংকে জমা রাখলে কত পারসেন্ট ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে, শিশির মনে মনে ভাবে।

রক্তের নমুনা নেবেন একজন ব্রাদার। শিশির সুই দেখেই চোখ বন্ধ করে। এইসব সুইসুতার কারবার মেয়েদের। ছেলেদের এইসব ছোটখাট বিষয় দেখতে নাই।

ব্রাদার বলেন, আপনি একটু কেবিনে গিয়া বসেন। ম্যাচ করল কিনা আমি বলতেছি।

শিশিরের ভেতরে সামান্য অস্থিরতা। তার মাথায় গ্যেটে ইন্সিটিউট, ঠান্ডা ঘর, মুরগিভাজা, ক্রেইনস আর ফ্লায়িং। সারা সন্ধ্যা কি এই হাসপাতালেই কাটাতে হবে নাকি?

সে বলে, টাইম লাগবে?

ব্রাদার লোক ভালো, বলেন, না। লাগবে না।

ভাই একটু তাড়াতাড়ি করেন, আমাদের না খুব জরুরি একটা কাজ আছে। আমাদের টিকেট করা আছে। আমরা ফ্লাইট মিস করতে পারি। বলে সে সেঁজুতির পেছন পেছন ব্লাড ব্যাংক ত্যাগ করে।

সেঁজুতি আবার কেবিনে ঢোকে। শিশিরও।

সেঁজুতি শান্তর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

শান্ত, তুমি বড় হয়ে কী হবা?

আমি। আমি বড় হয়ে কী হব?

হ্যাঁ।

শান্ত বলে, আমি বড় হলে ট্রাফিক পুলিশ হবো।

সেঁজুতি বলে, কেন ট্রাফিক পুলিশ কেন?

ট্রাফিক পুলিশের অনেক পাওয়ার। তারা হাত তুললে গাড়ি চলে। হাত তুললে থামে। লাল লাইট হলেও পুলিশ হাত তুলে ডাকলে গাড়ি চলে।

শিশির বলে, তুমি ঠিক বলেছ বাবা। ট্রাফিক পুলিশের অনেক পাওয়ার।

শান্ত বলে, তোমার নাম কী?

শিশির বলে, আমার নাম শিশির।

শান্ত বলে, তোমার নাম না। ওর নাম।

সেঁজুতি বলে, আমার নাম? সেঁজুতি।

শান্ত বলে, এইটা আবার কেমন নাম?

সেঁজুতি হেসে বলে, সুন্দর নাম।

শান্ত ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, পচা নাম।

সেঁজুতি বলে, তোমার নামটা সুন্দর না পচা।

শান্ত বলে, পচা। তারপর শিশিরকে দেখিয়ে বলে, তোমার সাথে ও কে?

সেঁজুতি বলে, আমার বন্ধু।

শান্ত বলে, আমারও বন্ধু আছে।

সেঁজুতি বলে, তোমার কয়টা ছেলে বন্ধু কয়টা মেয়ে বন্ধু।

তিনটা।

ছেলে কয়টা মেয়ে কয়টা?

তিনটাই মেয়ে।

ওরা সবাই হেসে ওঠে।

সিস্টার আবার আসেন। তিনি ঘোষণা করেন, আসেন। ব্লাড ম্যাচ করছে।

শিশির বলে, আমি এখানে থাকি।

সেঁজুতি বলে, থাকো। আবার ব্লাড দেখে ফিট টিট হয়ে গেলে উল্টা তোমাকেই হয়তো ব্লাড দিতে হবে।

শিশির বলে, আরে না। আমি রক্ত দিতে ভয় পাই নাকি। আসলে আমার ব্লাড রেখে দিচ্ছি দেশের কাজে লাগার জন্যে। বলা তো চায় না, কখন স্লোগান ওঠে, দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত, রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়।

সেঁজুতি বলে, সেই। নন্দলাল তো একদা একটি করিল ভীষণ পণ...

হাসতে হাসতে সেঁজুতি বেরিয়ে যায় গম্ভীর নার্সের পিছু পিছু।

শিশিরও তাকে অনুসরণ করে। এরপরে আর বসে থাকা যায় না।

সেঁজুতি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে শুয়ে রক্ত দিচ্ছে। হাতের মধ্যে সুচ। সেটা থেকে নল বেয়ে রক্ত জমছে ব্যাগে। ব্যাগটা রাখা হয়েছে হাতের তল থেকে নিচে, যাতে মাধ্যাকর্ষণের জন্যে রক্ত ব্যাগে জমা হয়। ব্যাগটা আবার নাড়া হচ্ছে রক্তটাকে জমতে না দেবার জন্যে।

রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে সেঁজুতি শুয়ে থাকে। রক্ত দেওয়া তার কাছে ডালভাতের মতো। প্রায়ই সে রক্ত দান করে। রক্ত দান করায় কোনো ক্ষতি নাই। যে কোনো পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষ রক্ত দান করতে পারে।

শিশির তার বিছানার পাশে এসে বসে। তার কপালে হাত রাখে। তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো সেঁজুতি?

আরে পাগল। তোমাকে না বলছি আমি অনেক রক্ত দিছি। আমার কাছে এইটা কোনো ব্যাপার না। রক্ত দেবার পরে খুব ভালো লাগে যখন কারো সত্যিকারের উপকার হয়। ওরা কত দোয়া করে।

নার্স আসে একটা সেভেন আপের বোতল নিয়ে। স্ট্রটা তার খোলামুখে কিছুতেই ডুবছে না। সিস্টার জানে না, আপেক্ষিক গুরুত্ব তাকে ডুবতে দেবে

না। এইটা আবিষ্কার করেছিলেন আর্কিমিডিস। সে বড় লজ্জার ঘটনা। তিনি ছিলেন ন্যাংটো। বাথটাবে নামার সাথে সাথে দেখা গেল পানি পড়ে যাচ্ছে আর তার ওজন কম মনে হচ্ছে। তিনি আর্কিমিডিসের বিখ্যাত সূত্রটা পেয়ে গেলেন। এইটা লজ্জার ব্যাপার নয়। সভ্যতার জন্যে গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু এত বড় বিজ্ঞানী ন্যাংটো অবস্থায় দৌড়ে বাইরে গিয়ে বলছিলেন, ইউরেকা, ইউরেকা। পেয়েছি। তার পরনে সুতোটা ছিল না। তার গোপন কথাটি সখি রইল না গোপন।

নার্স বোতলটা সেঁজুতির হাতে দেয়। সেঁজুতি বলে, শিশির এতটা খেতে পারব না। তুমি কিছুটা কমায়া দ্যাও তো।

নার্স বলেন, আপনাকেই খেতে হবে। আপনার বডি থেকে ফ্লুয়িড গেছে না!

সেঁজুতি বলে, আমি তো খাবই। এত খেতে পারব না। ও আগে কমাক।

শিশির বলে, বাবারে রক্ত দিছ। এখন খাও। আমি যেদিন রাজপথে রক্ত দেব, সেদিন আমিও খাব। নাও খাও।

শিশির বোতলটা ধরে স্ট্রর ওপরে আঙুল চেপে ধরে খানিকটা সেভেন আপ পাইপে তুলে পাইপটা উল্টো করে ধরে। এইভাবে সে খানিকটা তরল ফেলে দিয়ে স্ট্রটা পরিষ্কার করে নেয়। বাতাসের চাপ, শিশির মনে মনে ভাবে। আজ তার মনের ভেতরে বিজ্ঞানভাবনা বেশ কইমাছের মতো লাফাচ্ছে।

হয়তো তার বিজ্ঞানীই হবার কথা ছিল। কপালের ফেরে আজ সে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মী।

সেঁজুতি খানিকটা খায়। তারপর বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলে, শিশির, নাও খাও।

শিশির বলে, সিস্টার সিস্টার, আমারও এক ব্যাগ রক্ত নেন। এক ব্যাগ রক্ত দিলেই যদি এক বোতল সেভেন আপ পাওয়া যায়, তাইলে আমি বা বাদ যাই কেন। নেন নেন নেন।

তার কথা কেউ শোনে বলে মনে হয় না।

খানিকক্ষণ পরে সেঁজুতি ওঠে। বলে, চলো।

নার্স এগিয়ে আসে, যেতে পারবেন?

সেঁজুতি হাসে, হ্যাঁ হ্যাঁ।

তারা আবার যায় শান্তদের কেবিনে।

শান্তর মা সেঁজুতির হাত ধরেন। খুব কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলেন, মারে। তুমি তো মা ফেরেশতা। কোথাও ব্লাড পাচ্ছিলাম না। আল্লাহ তোমাকে পাঠাইছে মা।

আমি তোমাকে অন্তর থেকে দোয়া করি মা। আল্লাহ্ তোমার অনেক ভালো করবে মা অনেক ভালো করবে।

শান্তর মার চোখে জল। টিউব লাইটের আলোয় সেই জল চিকচিক করছে।

সেই দৃশ্য দেখে শিশিরেরও চোখ ভেজা ভেজা হয়ে যায়। সত্যি, সেঁজুতি ঠিকই বলেছে। রক্ত দান করবার পরে উপকৃত মানুষটি এমন আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যেটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। শিশিরও রক্ত দিতে শুরু করে দিবে নাকি! দিতে পারে। তবে তার রক্ত হলো এ প্লাস। সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য রক্ত। লোকে বলে এই গ্রুপের রক্ত হলো গরুর রক্ত।

তারপর শিশির ইংগিত করে সেঁজুতিকে, চলো।

সেঁজুতি বলে, আসি আন্টি। শান্ত থাকো। তোমাকে আমি আবার দেখতে আসব।

সেঁজুতি আর শিশির বেরিয়ে যায়।

হাসপাতাল থেকে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। আকাশে শিল্পীর তুলির খেলা। কে যেন মোটা তুলির টান দিয়েছে এপাশ ওপাশ। লাল কমলা গোলাপি ব্রাশ টেনেছে নীলের পটে। চমৎকার দেখা যাচ্ছে।

আর হলুদ রঙের আলো। শিশির বলে, এই জানো তোমার মুখে কনে-দেখা আলো পড়ছে। তোমাকে দেখা যাচ্ছে ধবধবা ফরসা। একেবারে পাত্রপক্ষ ঠকানো রোদ।

সেঁজুতি চোখ সরু করে বলে, মানে?

মানে বুঝলে না। আমার দিকে তাকায়া দ্যাখো। আমার মতো ভ্রমর কালো কৃষ্ণকেও কত ফরসা দেখা যাচ্ছে। এই রোদে এই রকম হয়। এই জন্যে এই সময়ে ঘটকেরা পাত্রীকে দেখায় পাত্রপক্ষের লোকজনকে। ফেয়ার এন্ড লাভলির আর দরকার হয় না। বিয়ে হয়ে যায়।

সেঁজুতি হাসে। আমার গায়ের রং নিয়া আমি চিন্তিত না। তবে তোমারটা নিয়া চিন্তিত। তুমি কিছুদিন রং-ফরসা করার ক্রিম ইউজ করে দেখতে পারো। এই শোনো, শান্ত ছেলেটাকে কেমন দেখলা!

চমৎকার। আরে কী পাকা পাকা কথা বলে।

এই ছেলেটার অসুখ হইছে চিন্তা করো। যতবার ওর মুখটা মনে পড়তেছে ততবার আমার চোখে পানি চলে আসতেছে।

না, ভালো হয়ে যাবে। আরে তোমার ব্লাড পাইছে না। তোমার ব্লাড পাইলে কারও পক্ষে খারাপ থাকা অসম্ভব। তুমি চিন্তা কোরো না।

কেন ব্লাড দেই, এখন বুঝছো তো!

হুঁ বুঝছি। তোমার দেখাদেখি আমারও ব্লাড দিতে ইচ্ছা করতেছে।

দিবা।

চায় না তো কেউ।

চাবে। দেখবা কখনও না কখনও বলবে, এ পজিটিভ ব্লাড লাগবে। কেউ আছে এ পজিটিভ! তখন তুমি আগায়া যাবা।

আচ্ছা যাব। নাও দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার গেটে ইন্সিটিউট মনে হয় দরজা বন্ধ করে ফেলল।

সেঁজুতি আর শিশির একটা রিকশায় ওঠে। চলেন ধানমন্ডি ৮ নম্বরের ব্রিজ পার হন। তারপর মাঠের বামের রাস্তা। মনে হয় সাড়ে আট নম্বর হবে।

ইস কী সাংঘাতিক যানজট। আজকে কি ক্রেইনস আর ফ্লায়িং দেখাই হবে না!



শান্ত পড়ে কেজি টুতে। তার রোগটা তত মারাত্মক কিছু না। একটা ছোট্ট অপারেশন লাগবে। আজকে রাতেই অপারেশনটা হবে। ব্লাড জোগাড় করে রাখা হলো। যদি লাগে, তখন দরকারের সময় কাকে কোথায় পাওয়া যাবে!

শান্ত আর তার মা কেবিনে। সেঁজুতি আর শিশির চলে যাবার পর শান্ত মাকে ডাকে।

মা, একটা কথা বলি।

বল।

তুমি হাসবা না তো।

না হাসব না। বল।

মা। আমি এই মেয়েটাকে বিয়ে করব।

মা হেসে ওঠেন।

হাসলা কেন? তুমি না বললা হাসবা না।

না হাসছি না তো। মা হাসি দমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

আমি কি কোনো হাসির কথা বলেছি...

না বাবা এটা কেন কোনো হাসির কথা হবে। এটা অবশ্যই একটা সিরিয়াস কথা। ঠিক আছে। বাবা আসুক। বাবাকে বলব। তোমার বাবা রাজি হলে আমরা প্রস্তাব নিয়ে যাব ওর বাসায়।

না মা এখন বিয়ে করব না তো। বড় হলে করব।

ঠিক আছে বড় হলে কোরো।

তাহলে বাবাকে এখনই বলার দরকার নাই। বড় হলে বোলো। শান্ত লজ্জা পাওয়া মুখ করে বলে।

রিকশা চলছে। শিশির আর সেঁজুতি বুঝতে পারে, বসন্তের দক্ষিণা সমীরণ বইতে শুরু করেছে। বাতাস এসে লাগছে চোখেমুখে। বেশ আরাম লাগছে। তারা নামে রিকশা থেকে, গ্যেটে ইন্সিটিটিউটের সামনে।

রিকশাভাড়া দেয় শিশিরই। তারা দ্রুত ঢুকে যায় গ্যেটে ইন্সিটিটিউটের হলে। ছবি শুরু হয়ে গেছে। তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকে, যাতে অন্য

কারো অসুবিধা না হয়। তারা অতি সন্তর্পণে পাশাপাশি দুটো ফাঁকা আসনে বসে পড়ে।

কিন্তু শিশিরের মোবাইল বেজে ওঠে আর সে লজ্জিত ভঙ্গিতে দ্রুত মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে অফ করতে চায়। কিন্তু জিনসের প্যান্ট থেকে মোবাইল বের করা সত্যি মুশকিল, যদি তুমি বসে থাকো। এবার শিশিরকে দাঁড়াতে হয়। পেছনে বসা দর্শক খুবই বিরক্ত হন।

সেঁজুতি হাসে। আজ তার সব কিছুতেই আনন্দ। আজকে সে রক্ত দিয়েছে। আজকে সে একটা মানুষের সেবায় লাগতে পেরেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ছবির মধ্যে ডুবে যায়। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে গল্প। খুবই আবেগপূর্ণ ছবি।

এক সময় সেঁজুতির চোখে জল চলে আসে।



টেন টু টেন সুপার শপে আজকে ক্রেতার সংখ্যা কম। সেঁজুতি গান শুনতে শুনতেই যথারীতি কাজ করছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতার বই আছে। কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছ। কাস্টোমাররাও জিনিস ধরে ধরে কোথাকার জিনিস যে কোথায় রাখে।

সেঁজুতি বিভিন্ন র‍্যাকে যাচ্ছে। হাতে কাগজ-কলম। কোথায় কোন পণ্য কম, তার তালিকা করছে। জিনিসপত্র যথাস্থানে সাজিয়ে রাখছে সে।

রত্নাও যথারীতি কাজে এসেছে। সুপারভাইজার স্যার তাকে উৎসাহিত করেছেন, বলেছেন, কে কেমন কাজ করছে, সব তিনি মনে রাখছেন, ভবিষ্যতে এইসবের মূল্যায়ন হবে। দেখা যাক কোন কচুটা হয়।

রত্না সেঁজুতির কাছে আসে, বলে, কর্ক ওপেনার কই রাখছ?

সেঁজুতি তার কানের গান শোনার যন্ত্র নামিয়ে বলে, আবার বলো।

রত্না মুখটা শক্ত করে। তারপর বলে, কর্ক ওপেনার কই রাখছ?

সেঁজুতি হাসে– সি নম্বর রোয়ের মাঝখানের তাকে।

রত্না তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, কর্ক ওপেনার কি ওইখানে রাখার কথা।

সেঁজুতির মুখে হাসি যেন ধরতেই চায় না, তাই তো।

আর এই জিনিসটা এই রোতে আসল কীভাবে?

কোনো কাস্টোমার রেখে গেছে মনে হয়।

তাইলে তোমার কাজ কী?

সেঁজুতি খিলখিল হাসি দিয়ে বলে ওঠে, হইছে বাবা, এমন গম্ভীর মুখে কথা বলতেছ কেন। জিনিসটা একজন কাস্টোমার হয়তো রেখে গেছে। তুমি জায়গামতো রাখো না কেন।

রত্না চোখেমুখে রাজ্যের অন্ধকার টেনে এনে বলে, আমাকে কী করতে হবে না হবে সেইটা তুমি বলার কে। আমি আমার কাজ ঠিকমতোই করি। এইসব জালালি কবুতর যে কোত্থেকে আসে....

রত্না রাগ দেখিয়ে চলে যায়।

সেঁজুতির হাসি আরও বেড়ে যায়। তার কানে আবারও গান বেজে ওঠে। এইবার অঞ্জন দত্তের গান, রঞ্জনা আমি আর আসব না...পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং

খোড়া করে দেব, বলেছে পাড়ার দাদারা, চশমাটা পড়ে গেলে মুশকিলে পড়ি, দাদা আমি এখনও যে ইশকুলে পড়ি, কজির জোরে আমি পারব না, রঞ্জনা আমি আর আসব না...গান শুনে সেঁজুতির হাসি আরও বেড়ে যায়।

মেয়েটার হাসিরোগ আছে।

তার হাসি আরও বেড়ে যাচ্ছে গতকালের হাসপাতালের ঘটনা মনে করে।

গতকাল তারা গিয়েছিল হাসপাতালের কেবিনে, শান্তকে দেখতে। ওর অপারেশন হয়ে গেছে। ও ভালো আছে। দেখে খুব ভালো লাগল। তোমার দেওয়া রক্তে যদি কারও উপশম হয়, তোমার ভালো লাগবে না!

কেবিনে শিশির আর সেঁজুতি আর শান্তর মা।

শান্ত বিছানায় শুয়ে আছে। ওদেরকে ঢুকতে দেখে উঠে বসে।

সেঁজুতি বলে, তোমাকে দেখতে আসলাম। এখন কেমন আছ।

শান্ত বলে, আমার অপারেশন হইছিল তুমি জানো।

তাই নাকি?

অনেক কষ্ট পাইছি।

আহারে। এখন কোনো কষ্ট নাই তো।

না নাই। একটু আগে একটু একটু ছিল।

একটু আগে একটু একটু ছিল। এখন নাই?

না। তুমি আসছ। এখন আর কোনো কষ্ট নাই।

সেঁজুতি হাসি সংবরণ করার চেষ্টা করে।

শান্তর মা বলেন, ও তো তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

শান্ত ভ্যা করে কেঁদে ফেলে– কেন বললা? কেন বললা?

সেঁজুতি বলে, এই পাগলা কাঁদে না। হাসপাতালে কেউ কাঁদে!। আচ্ছা আমাকে বিয়ে করতে হবে না। আমি এই কাকতাড়ুয়ার মতো দেখতে আংকেলটাকেই না হয় বিয়ে করব। আর তোমার জন্যে খুব সুন্দর দেখে একটা কনে জোগাড় করব। লাল টুকটুকে শাড়ি পরবে।

শান্ত কান্না থামায়। বলে, তুমি এই আংকেলটাকে বিয়ে করবা?

সেঁজুতি কপট গম্ভীরতা চোখে-মুখে ফুটিয়ে হাসি চেপে বলে, যদি তুমি বলো! তুমি কী বলো, করব?

ওই আংকেলটা পচা!

আমিও তো তাই বলি। ভালো তো আসলে তুমি। তাই না!

তুমিও পচা। তোমরা এখন যাও।

আচ্ছা বাবা যাচ্ছি। আগে তুমি হাসো।

না তুমি যাও।

তোমাকে কিন্তু কাতুকুতু দিব!

আমার কাতুকুতু নাই।

আচ্ছা তাহলে তোমাকে একটা হাসির কথা বলি। বলব।

না।

কেন, বলি!

না।

কেন?

বললে আমি হাসব। আমি হাসতে চাই না।

ও আচ্ছা তুমি হাসতে চাও না। ঠিক আছে। তাহলে তুমি শুনো না। কান বন্ধ করে রাখো।

প্যারেড হচ্ছে। টিচার বলছেন, যখন লেফট বলব, তখন বাঁ পা তুলবে। আর যখন রাইট বলব, তখন ডান পা। ছাত্র বলল, ঠিক আছে। টিচার বললেন, লেফট। ছাত্র বাঁ পা তুলল। টিচার বললেন, রাইট। ছাত্র আর ডান পা তোলে না। টিচার বললেন, কী ব্যাপার তুমি ডান পা তুলছ না কেন। ছাত্র বলল, দুই পা তুললে আমি দাঁড়িয়ে থাকব কী ভাবে। আপনার ওই ছাতার ডাঁটার ওপরে।

শান্ত খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে হেসে ফেলে খিলখিল করে।

শিশির আর সেঁজুতি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাদে।

লাল ইটের বিল্ডিং, গাছগাছালিতে ঢাকা, বিচিত্র ফুল আর পাতাবাহার সাজানো এখানে ওখানে।



একটা চাকরির এড দিছে। দেখছ?

শিশির বলে, দেখছি।

করবা না এপ্লাই।

আরে না। তুমি করো। বলেই দিছে উমেন কেন্ডিডেটসদের প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। আমি এইটার মধ্যে নাক ঢুকায়া কী করব। তুমি করো।

আমিই তো করবই। একজনের অন্তত ভালো একটা জব লাগে। তাই না। নাইলে তো বিয়ে শাদি করা যাবে না।

সেই। আবার তুমি ইউনিসেফের জব পাইলে আমাকে কেন বিয়ে করতে যাবা, তাই না।

মানে?

মানে তোমার ভালো জব। ভালো স্যালারি। দেখতে শুনতেও তুমি তো খারাপ না। আমার মতো একটা ভাদাইমা পোলারে কেন তুমি বিয়া করতে যাবা। তাই না?

সেঁজুতি হাতের চায়ের কাপের অবশিষ্টাংশ শিশিরের মাথায় ঢেলে দেয়।

এই পাগলি, এইটা করলা?

তুমি যদি আরেকবার এই জাতীয় কিছু বলো, তাইলে তোমার খবর আছে।

আরে আমি কী এমন বললাম।

না, তুমি বলবা না।

ঠিক আছে ঠিক আছে বলব না। তোমার আমার বিয়ে হবেই হবে। পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নাই তোমার আমার বিয়ের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঢং কইরো না। এইবার মাথার ওপরে কাঁচা আমের শরবত ঢেলে দিব।

দিও না গো। আশে-পাশে সব কেন্দ্রের ছেলে- মেয়ে। ওরা আমাকে গুরু বলে মানে। এখন আমার এই হেনস্থা দেখে ওরা কিন্তু খুবই চিন্তায় পড়ে গেছে। ছেলেরা ভাবতেছে, বিয়ের আগেই এই অবস্থা। বিয়ের পরে তো লোকটা মাইর খাবে। আর মেয়েরা ভাবতেছে...

মেয়েরা কী ভাবতেছে?

সেইটা আমি ঠিক জানি না। আমি মেয়েদের মনের খবর পড়তে পারি না।

পারো না? না? তুমি হইলা মিচকা শয়তান। তোমার সব খবর আমার জানা আছে।

পাশের বাড়ির ছাদের ওপরে একটা চাঁদ উঁকি দেয়। আধখানা হাতে বেলা রুটির মতো একটা চাঁদ। নারকেলের পাতার ফাঁক দিয়ে কীভাবে উঁকি দিচ্ছে।

নিচতলায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসেছে। বাইরে লিচুতলায় স্পিকার মনে হয় রাখা আছে একটা। কী একটা ধুন ভেসে আসে নিচ থেকে।

ওদের দুজনের কাছে সবকিছু মনে হচ্ছে অন্য জগতের।

তারা জানে না, তাদের ভবিষ্যত কী। কিন্তু এইভাবে এইখানে প্রদোষের আলো-আঁধারির মধ্যে বসে থাকতে তাদের খুব ভালো লাগে।



শান্তকে রক্ত দেবার পরে মাস ছয়েক কেটে গেছে। এখন শুভ্রতম শরৎকাল। আকাশ নীল। সাদা মেঘের বেলাও দেখা দিচ্ছে। বাতাসের শীতের ঘ্রাণ। গায়ের চামড়ায় শুকনো হাওয়ার টান। সেঁজুতিদের গলির মুখে একটা শিউলি ফুলের গাছ আছে। সকালে যখন সে টেন টু টেন শপিং সেন্টারের দিকে যায়, গলিপথে ছড়ানো শিউলি ফুল মাড়িয়ে যেতে হয়।

তুমি যে গিয়াছ বকুলও বিছানো পথে...দিয়ে গেছ হায় একটি কুসুম তোমারই কবরী হতে...

সে শিশিরকে এসএমএস করে, দ্যাখো, আকাশে শরৎকাল। কী রকম নীল আর সাদা।

শিশির ফোন করে, হ্যাঁ। এই সেই মাস যে মাসে আমি ঝরব।

মানে কী?

মানে আমি শিশির না! আমি তো শরৎকালেই শিউলি ফুলের গায়ে জমব আর ঝরে যাব।

ও আচ্ছা! আচ্ছা!

আর তুমি হলে সেঁজুতি। তুমি জ্বলবে। আলো ছড়াবে। তোমার মতো মানুষ চান আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার।

রত্নার সঙ্গেও সেঁজুতির খাতির হয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটল এই রকম ভাবে, রত্না শুক্লাকে বলে, এই তোমার ব্লাড গ্রুপ না এবি নেগেটিভ!

সেঁজুতি জবাব দেয়, হ্যাঁ। কেন।

রত্না বলে, ভাই আমার একটা উপকার করবা। আমার দুলাভাইয়ের ডেংগু। অনেক ব্লাড দরকার।

দাঁড়াও হিসাব করে নেই। আমি যে শান্ত নামের ছেলেটাকে ডোনেট করলাম, কতদিন হলো... হয়ে গেছে মাস ছয়েক... আচ্ছা দিব...

রত্না আশ্বস্ত হয় খানিকটা, থ্যাংক ইউ বলে সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করে। আপা... শোনো একজন পাওয়া গেছে দুলাভাইয়ের গ্রুপ...আমার সাথেই কাজ করে, দিবে, অন্তত এক ব্যাগ তো হলো। কী বলো।

সেঁজুতি বলে, এবি নিগেটিভ ব্লাডের অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমরা একটা ওয়েব সাইট মেইনটেইন করি। আরও রক্ত লাগলে আমাকে বোলো আমি হেল্প করতে পারব।

রত্না সেঁজুতিকে জড়িয়ে ধরে।

সেঁজুতি বলে, এই পাগল, কী করো।

সেঁজুতি রত্নার দুলাভাইয়ের জন্যে রক্তদান করলে রত্না সেঁজুতির প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

রত্না সুপারভাইজারের কাছে যায়। সেঁজুতির পক্ষ নিয়ে ওকালতি করে-- স্যার। সেঁজুতি মেয়েটা এক বছর হলো এই শপে। ওর জন্যে আমাদের সিস্টেমটা কত ডেভলপ করছে। কী সুন্দর করে ও সব লেজার মেইনটেন করতেছে। আর স্যার আপনি ওর বেতন বাড়ান না কেন? এত অল্প বেতন দিলে ও থাকবে? থাকবে না। চলে যাবে। আর এইটা কি? লাভ তো আপনারা কম করেন না। সেঁজুতির বেতন বাড়ান না কেন?

সুপারভাইজার হাসেন। বাড়াব বাড়াব। তুমি যখন বলেছ, তখন তো বাড়াতেই হবে।

জি স্যার বাড়াবেন। কর্মীদের ঠকালে সেই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হতে পারে না।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সুপারভাইজার হাসেন।

কাজের অবসরে রত্না আর সেঁজুতি এখন রোজ এক সঙ্গে দুপুরের খাবার খায়। টিফিন বক্সে করে দুজন খাবার আনে। তারা দুজনে একে অন্যের পাতে খাবার তুলে দেয়। একজনের তরকারি দুইজনে ভাগাভাগি করে খেলে দুজনেরই লাভ হয়। খাওয়াটা বেশ জমে।

গানের যন্ত্রটাও ওরা শেয়ার করে। কানে কানে।

একটা নতুন গানের সিডি বেরিয়েছে: কৃষ্ণ।

এত কিছু করে শেষ পর্যন্ত... সতীন।

আরে কথার কথা বললাম।

কথার কথাই বলার দরকার কী। হি হি হি হি...

হাসিস কেন?

হাসির কথা বললে হাসব না।

রত্নার ফোন বাজে।

রত্না ফোন দেখে বলে, এই দুলাভাই ফোন করছে। তোর সাথে কথা বলার জন্যে। করবে না? রক্তের টান আছে না একটা। দুলাভাই। নেন কথা বলেন। রত্না ফোনটা সেঁজুতির দিকে এগিয়ে দেয়। আমি কী কথা বলব বলে সেঁজুতি মাথা নাড়ে। তা সত্ত্বেও রত্না তার হাতে ফোন ধরিয়ে দিলে সে বলে, জি দুলাভাই স্লামালেকুম।

ওয়ালাইকুম আসসালাম। ও পাশ থেকে রত্নার দুলাভাই বলেন।

এখন শরীরটা কেমন?

আছি আল্লায় রাখছে। তোমাদের দোয়া। একদিন দেখতে তো আসলা না।

জি দেখতে যাবো। ব্যস্ত থাকি দুলাভাই সময় হয় না যাবো। যাবো। রত্নাই তো নিয়ে যায় না...

রত্না তো নেবে না। বুঝলা না ঈর্ষা করে। তোমার আমার তো ব্লাড কানেকশন। ওর সাথে তো আর আমার ব্লাড কানেকশন না। এখন শালি হিসাবে যদি তোমাকে বেশি আদর করি, সেই ভয় পায় আর কী।

তাই হবে।

শোনো, ওর উপরে ভরসা কোরো না। একদিন চলে আসো। তোমাদের আপা খুব ভালো রান্না করে। প্রায়ই বলে, রত্নার ফ্রেন্ডটা তোমাকে ব্লাড দিল। তুমি তো একদিন দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালাও না।

আরে কিসের! দাওয়াত-টাওয়াত লাগবে না। এমনিতেই আসব।

আর তুমি আসছ! সুন্দরী মেয়েরা কি আর কোমর বাঁকা দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসে।

না দুলাভাই। আপনি অনেক হ্যান্ডসাম আছেন।

ডেংগুটা না হইলে বুঝছ কোমরটা সোজাই ছিল।

এখন রাখি দুলাভাই। আমাদেরকে আবার কাজে যেতে হবে।

আচ্ছা যাও। শোনো, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। ইউ আর নট আ গার্ল। ইউ আর জাস্ট এন এঞ্জেল।

থ্যাংক ইউ।

এখন রাখি সেঁজুতি।

জি দুলাভাই থ্যাংক ইউ।



সময় গড়িয়ে যায়।

শিশির একটা ভালো চাকরি পেয়ে যায় একটা দেশি এনজিওতে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অভিজ্ঞতটাকে ওরা দাম দিয়েছে যাহোক। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ছাড়তে অবশ্য তার বেশ কষ্ট হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার অনেক মধুর স্মৃতি।

সায়ীদ স্যারের বক্তৃতা, ছাদের আড্ডা, সভ্যদের সঙ্গে মাসিক আসর-- খুব মজার ছিল এখানকার সময়টা। ইচ্ছা ছিল নতুন অফিস থেকে বেরিয়ে রোজ সন্ধ্যায় সে কেন্দ্রে চলে আসবে। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠে না। নতুন অফিসে অনেক কাজ। অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে রাত ৭টা ৮টা বেজে যায়। একটাই সুবিধা। সপ্তাহে দুইদিন ছুটি।

ওই দুটো দিন তার কাটে সেঁজুতির জন্যে প্রতীক্ষায়।

শিশিরের ছোটবোনের বিয়ে সামনের মাসে। বিয়েটা হয়ে গেলেই শিশির নিজের বিয়ের কথাটা পাড়বে।

অন্য দিকে সেঁজুতিরও কথা হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থায়। ওই চাকরিটা পেয়ে গেলে অতো টাকা দিয়ে ওরা কী করবে দুজনে হিসাব করে।

এই সেঁজুতি তোমার এই চাকরিটার বেতন যেন কত?

আমার চাকরি কোথায় দেখলা। ওরা লোক চাইছে। কাকে নেবে তা তো জানি না।

বুঝলাম। ওই পোস্টে স্টার্টিং কত?

তিরিশ।

তোমার তিরিশ। আমার পনেরো। হল পঁয়তাল্লিশ। এত টাকা দিয়ে আমরা কী করব।

যাও আমার চাকরিটা হচ্ছে তোমাকে কে বলল।

হতেই হবে। ওরা যা কোয়ালিফিকেশন চাইছে সব তোমার সাথে মেলে।

তুমি কচু বোঝো।

আচ্ছা শোনো না। যদি স্বপ্নে খাই, পোলাও কোর্মাই খাই। ধরো তোমার চাকরিটা হয়ে গেল। তারপর...

তারপর কী। আগে আমাদের বিয়ে।

রাইট। তার আগে আমরা দুইজনে ঘুরে ঘুরে বাসাভাড়া নিব।

অবশ্যই। একটা ছোট্ট বাসা নিব। দুই রুমের বাসা।

এত টাকা বেতন পাবা। মাত্র দুই রুমের বাসা নিবা।

তুমি বাসাভাড়াতেই সব টাকা খরচ করে ফেলবা নাকি।

গত মাস পর্যন্ত তুমি আমি কতটাকা পাইতাম। তখনও তো চলতে পারছি। আর বাসাভাড়া যদি ১৫ হাজার টাকাও দেই, তাইলেও তো ৩০ হাজার টাকা থাকবে।

সেঁজুতি শিশিরের চুল টেনে ধরে বলে, আরে গাধা। আমাদেরকে টিভি কিনতে হবে। ফ্রিজ কিনতে হবে। ফার্নিচার কিনতে হবে। চুলা কিনতে হবে। থালাবাসন কিনতে হবে।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তারপরেও এত টাকা।

আরে আমি চাকরিটা যে পাবই, তার তো কোনো ঠিকঠিকানা নাই।

তাহলেও আমাদের চলে যাবে। আমার ১৫। তোমার ৫। ছোটবাসা নিব। ছোট টিভি কিনব। ছোট ফ্রিজ। আর ছোট ছোট কাপ পিরিচ। ছোট ছোট করে চা খাব।

তাই খেতে হবে। সব ছোট ছোট।

ওরা এইসব স্বপ্ন দেখে। ছোট স্বপ্ন। বড় স্বপ্ন দেখতেও ওদের ভয়।

শিশির বলে, সায়ীদ স্যার বলেন, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আসো বড় স্বপ্ন দেখি।

সেঁজুতি বলে, দেখো।

শিশির বলে, তুমি থাকবা মঙ্গলগ্রহে, আমি থাকব বৃহস্পতিতে, আমাদের বিয়ে হবে ইউরেনাসে, তারপর আমরা হানিমুনে যাব অন্য কোনো নক্ষত্রে!

সেঁজুতির চোখে জল।

এই সেঁজুতি, কী হলো, কাঁদছ কেন।

জানি না। মনে হচ্ছে সুখে। তোমার কথা আমার খুব ভালো লাগছে শিশির।



আবার একটা জায়গা থেকে ফোন আসে সেঁজুতির কাছে। রক্ত দিতে হবে। ৫ মাস পরে ব্লাড তো দেওয়া যায়ই।

সেঁজুতি হাজির হয়েছে পঙ্গু হাসপাতালের উল্টা দিকের একটা ক্লিনিকে। রোগী একজন বয়স্ক মানুষ। পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে গেছে। বিরল গ্রুপের রক্ত তাঁর। কোথায় পাবেন। সন্ধানীর মাধ্যমে ফোন আসে সেঁজুতির কাছে।

সেঁজুতি হাসপাতালে যায়। রোগীর কেবিনে ঢোকে। রোগী একজন কবি। ভালো কবিতা লেখেন তিনি। তার নাম আসলাম আজাদ। তার কবিতা একবার সেঁজুতি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে আবৃত্তি করেছিল। বৃন্দ আবৃত্তি।

হাসপাতালে কবির নাতনির মুখে সেঁজুতি কবির পরিচয় জানতে পারে। নাতনিটি আবার পড়ে ডেন্টাল কলেজে। তার নাম ভোর। এই রকম নাম এর আগে সেঁজুতি কখনও শোনেনি। কে এত সুন্দর নাম রেখেছে? তখনই নাতনি জানায় যে তার দাদু কবি।

সেঁজুতি কাছ থেকে একজন কবিকে দেখে। কবির শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই বয়সে হাড় ভাঙা ভালো লক্ষণ নয়।

সেঁজুতির রক্ত ম্যাচ করে কিনা, জানার জন্যে নমুনা দিতে হয় ব্লাডব্যাংকে। কেবিনে ফিরে এসে সেঁজুতি পটর পটর করে কবির সঙ্গে গল্প করে।

সেঁজুতি বলে, আমি আপনার কবিতা আবৃত্তি করেছি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়।

কোন কবিতা?

ওই যে:

কারফিউ কারফিউ
বিড়াল ডাকে মিউ মিউ
নিউ মার্কেট নিউ নিউ
আইল দেশে কারফিউ
বিড়াল নাকি বাঘের মামা—আর মনে নাই...

কবি বিছানায় শুয়ে হাসেন। তার গাল বসে গেছে। সাদা দাড়ি বেরিয়েছে থুতনি ভরে। তিনি বলেন, ঊনসত্তর সালে লিখেছিলাম। তখন দেশে কারফিউ দেওয়া হয়েছিল। যেদিন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে একজন শিক্ষক মারা গেল

আর্মির গুলিতে, সবাই কারফিউ ভেঙে রাস্তায় চলে এল। পুরা দেশের মানুষ রাস্তায়। আর্মি আর কাকে গুলি করবে...তখন শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হলো। শেখ সাহেব বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন। ভাসানির খুব ভূমিকা ছিল...

এই সময় খবর আসে, নার্স এসে বলে, ব্লাড ম্যাচ করেনি। ব্লাড ব্যাংকে ডোনারকে ডাকে।

সেঁজুতির এই অভিজ্ঞতা আগে হয় নাই। ব্লাড তো সাধারণত ম্যাচ করে।

সে কবিকে বলে, দাদু আসি। আমার মনে হয় আপনাকে ব্লাড দেওয়া ভাগ্যে নাই।

কবি বলেন, শোনো, একজন কবি কী বলছেন জানো, বাংলাদেশের মাটিই হলো ব্লাড ব্যাংক। তার অনেক রক্ত লাগে।

ভোর বলে, দাদু আপনাকে পেয়ে অনেক কথা বলতেছে। আপনি যান। নাহলে আরও বকবক শুনতে হবে।

ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে সেঁজুতি যা শোনে, তাতে তার আক্কেল গুড়ুম।

ডাক্তার বলেন, শোনেন আপনার ব্লাডে একটা ভাইরাসের লক্ষণ আসছে। আপনার ব্লাড দেওয়া উচিত না।

কী বলেন। আমি তো অনেক ব্লাড দিছি।

না, আপনার ব্লাড দেওয়া উচিত না। আরেকটা কথা, আপনি একটু ব্লাডটা আইসিডিডিআরবিতে টেস্ট করান তো। কী টেস্ট করাবেন আমি লিখে দিচ্ছি।

ডাক্তার সাহেব কতগুলো টেস্ট দেন। আপনি অবশ্যই এই টেস্টগুলা করাবেন। হেলাফেলা করাবেন না। পরে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে।

কিন্তু সেঁজুতি টেস্টগুলো করাবে করাবে করেও করিয়ে উঠতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় তার চাকরিটা হয়ে যায়। তারা তাকে ট্রেনিংয়ের জন্যে শ্রীলঙ্কা পাঠিয়ে দেয় ছ সপ্তাহের জন্যে। সেখান থেকে এসে তার পোস্টিং হয় খুলনায়। খুলনায় তাকে থাকতে হবে আরও ছয় মাস।

কোনো মানে হয়।

এদিকে শিশিরের বোনের বিয়েটাও ভেঙে যায়। শিশিরের পরিবার থেকে বোনের জন্যে নতুন পাত্র দেখা হচ্ছে। ওদের বিয়েটাও তাই পিছিয়ে দেওয়া হয়।

ওরা দুজন ঠিক করে, এখন তারা কষ্ট করবে। টাকা জমাবে।

ছয় মাস পরে হাতে বেশ কিছু টাকা জমলে তখন তারা একবারে বাসাভাড়া নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে ভালোমতো সংসার করা শুরু করবে। ততদিনে সেঁজুতি বদলি হয়ে ফিরে আসবে ঢাকায়।

সেইসব দিনে শিশির প্রায়ই বৃহস্পতিবার উঠে পড়ত খুলনার বাসে। ভোরবেলা পৌঁছে যেত খুলনায়। সারাদিন সেঁজুতির সঙ্গে ঘুরে ফিরে রাতের বেলায় আবার উঠত আরেকটা বাসে।

পরের দিন ভোরবেলা ঢাকায় পৌঁছে সারাদিন গড়াত নিজের বিছানায়।

ছ মাস শেষ হওয়ার আগেই ঢাকায় বদলি হয়ে আসে সেঁজুতি।

কিন্তু তার শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না ইদানীং।

মনের জোরে সে চলছে। শিশিরের বোনের বিয়েটা ঝুলে গেছে। আর অপেক্ষা করতে ভালো লাগছে না। কী যে করবে তারা?

একদিন রিকশায় যেতে সেঁজুতি শিশিরকে বলে, এই শরীরটা ভালো লাগতেছে না। বুঝছ।

ডাক্তার দেখাও। শিশিরে চোখেমুখে উদ্বেগ।

না কোনো অসুখ তো নাই। এমনিতেই খিদা লাগে না। আর খুব বমি পায় বুঝছ।

যা অনিয়ম তুমি করো। রাত জেগে বই পড়ো। খাও না।

আরে আমাদের মেসের বুয়া ছুটিতে গেছে। মেয়েরা সব নিজেরা রেঁধে খায়। আমার আবার রান্নাবান্না ভালো লাগে না। বুঝছ।

শোনো। আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলি। আমি খুব ভালো খিচুরি রান্না করতে শিখে গেছি। তুমি আরাম করে খেতে পারবা। শিশির বলে।

তাই করতে হবে। বাসা থেকেও বিয়ের চাপ দিচ্ছে।

শোনো। আমার বাসা থেকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে মেনে নিবে না। আগে কাজি অফিসে গিয়া রেজিস্ট্রি সেরে ফেলব। বুঝছ।

ঠিক আছে। কবে করবা?

কবে করতে চাও।

কালকে।

ছুটির দিনে করি।

করো।

২৬ শে মার্চ। ঠিক আছে। আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এরপর থেকে তুমি আমি স্বাধীন।

না স্বাধীনতা দিবস না। বিয়ের দিন স্বাধীনতা দিবস না।

তাইলে ২৫ মার্চ। কালরাত।

সেইটা চলতে পারে। না আমাদের বাসর কালরাতে হবে। এইটাও হয় না।

আচ্ছা তাইলে ২৪।

ঠিক আছে...বলে সেঁজুতি ওয়াক করে ওঠে। রিকশাওয়ালা রিকশা থামায়। রাস্তার ধারে বসে সেঁজুতি বমি করে। শিশির তার মাথার দুপাশটা ধরে রাখে দুই হাতে।



সেঁজুতির হাতপা হলুদ। চোখের সাদা অংশ হলুদ। তার খিদা পায় না। বমি বমি লাগে। লক্ষণ স্পষ্ট। তার জন্ডিস হয়েছে। যে দেখে, সেই এ কথা বলছে। অগত্যা সেঁজুতি শিশিরকে সঙ্গে নিয়ে যায় ডাক্তারের চেম্বারে। ডা. রাশেদুল হাসান। পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞ। বেশ ভিড় তার চেম্বারে। এখানে এসে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের অর্ধেক লোক লিভারের জটিলতায় ভুগছে। সিরিয়াল দিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। শিশির মন দিয়ে টেলিভিশনে জাটকা মাছ না ধরার উপকারিতা দেখছে। নদীর ধারে শিল্পী মমতাজ গান করছেন। গানের কথা, ভাইসকল, জাটকা মাছ ধরো না।

শিশির বলল, শোনো, জাটকা মাছ ধরতে মানা করতেছে। এইটাকে আমি সমর্থন করি। তবে ইলিশ মাছ কমার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে।

তা তো পারেই। সেঁজুতি অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে।

না মানে। একটা ইলিশ মাছের পেটে কোটি কোটি ডিম থাকে। কাজেই ১০০ টা মাছও যদি ডিম পাড়ে, আর তার সবগুলো ডিম থেকে যদি বাচ্চা হয়, ইলিশ মাছে সমুদ্র ভরে যাওয়ার কথা। কিন্তু আসলে তো ডিম পাড়ে, ধরা পড়ার পরেও, অনেক মাছ। তারপরে মাছ নাই কেন?

কেন?

ওই তো বললাম, পরিবেশের কোনো একটা প্রভাব আছে। হয়তো সমুদ্রের পানি বা নদীর পানিতে ক্ষতিকর পদার্থ মিশতেছে। যেইভাবে ক্ষেতে-খামারে কীটনাশক দিতেছে।

সিরিয়াল এলে ডাক পড়ে। ওরা চেম্বারের ভেতরে যায়।

ডাক্তার সাহেব খুবই হ্যান্ডসাম। লম্বা, নির্মেদ, উজ্জ্বল শ্যামলা। সেঁজুতি তাকে দেখে মুগ্ধ। এই রকম ডাক্তারের সামনে বসলেই তো অসুখ অর্ধেকটা সেরে যায়।

ডাক্তার সাহেব বলেন, রোগী কে?

সেঁজুতি বলে, আমি।

ডাক্তার বলেন, আপনি এই চেয়ারে বসেন। নাম কী?

সেঁজুতি রহমান।

বয়স?

২৭।

সমস্যা কী?

খেতে ইচ্ছা করে না। বমি পায়। পেশাব হলুদ।

দেখি। হা করেন। জিভ বের করেন। জন্ডিসের লক্ষণ তো। ব্লাডটা টেস্ট করান। লিখে দিচ্ছি। কী কী টেস্ট লাগবে। টেস্ট করায়া রিপোর্ট নিয়ে আসেন। কোনো ওষুধ দিচ্ছি না। পানি খান বেশি করে।

তারা ওঠে। পপুলার ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে গিয়ে প্যাথলজিকাল টেস্টের জন্যে রক্ত ইত্যাদি দেয়। পপুলারেও ভীষণ ভিড়। বাংলাদেশের সব লোকই কি আজকে অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি?

সেঁজুতি অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। তার এখন বিশ্রাম। সে মেসে শুয়ে বসে থাকে।

সামনের মাস থেকে তাদের নতুন বাসায় ওঠার কথা। সে আর শিশির রিকশায় চড়ে এক শুক্রবার বের হয়েছিল। হাতে একটা দৈনিক পত্রিকা। অনেক বাসাভাড়ার বিজ্ঞাপন ছিল সেই কাগজে।

একটা এলাকার সবগুলো টু লেট তারা কাগজে দাগ দিয়ে রেখেছে। তারপর বেরিয়েছে ওই পাড়ায়।

একেক বাসার একেকটা দিক ভালো, একেকটা দিক খারাপ। কোথাও পাশের ফ্লাটের ভাড়াটে বলে, পানি থাকে না তো এই বাসায়। কোথাও বারান্দার সঙ্গে সামনের বাসার রান্নাঘর মুখোমুখি। কোনোটা বেশি অন্ধকার। কোনোটার ভাড়া বেশি।

একটা বাসা তাদের মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু অগ্রিম বেশি চাচ্ছে। ৬ মাসের অগ্রিম দেওয়া কি যা তা কথা।

বাসা খুঁজতে আরেকবার বেরুতে হবে। তারপর ফার্নিচার। সেঁজুতির পছন্দ বেতের আসবাব, শিশির বলছে একবারে ভালো দেখে নিই। চলো, মিরপুরে ফার্নিচারের বিরাট মার্কেট। একবার ঘুরে আসি।

যাওয়ার কথা ছিল পরের শুক্রবারে। তার মধ্যে এই ঝামেলা।

শিশির আসে তাদের মেসের ওয়েটিং রুমে। সবাই তাকে চেনে। সেঁজুতি বিছানা ছেড়ে যায় শিশিরের কাছে। শিশিরের হাতে একটা ফ্লাস্ক। সে একটা আখ মাড়াইয়ের কলের সামনে দাঁড়িয়ে আঁখ মাড়িয়ে রস কিনে ফ্লাস্কে ভরে এনেছে।

পরের দিন তারা আবার যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন, ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট আনছেন।

শিশির বলে, জি। এই যে রিপোর্ট।

ডাক্তার খাম খুলে রিপোর্ট দেখে গম্ভীর হয়ে যান।।

শিশির বলে, ডাক্তার সাহেব। খারাপ কিছু?

ডাক্তার বলেন, যা ভাবছিলাম তাই। ঠিক আছে। আমি ওষুধ দিচ্ছি। তিনি প্রেসক্রিপশনে লিখতে লিখতে বলেন, ফুল রেস্ট। পানি খান। খাওয়া-দাওয়া যা সহজপাচ্য। মাংসটাংস না খাওয়া ভালো। আমি আরো কিছু টেস্ট দিচ্ছি। এগুলো করান। ঠিক আছে...

ওরা ওঠে। বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়। ডাক্তার বলেন, ভাই আপনি একটু শুনে যাবেন।

শিশির বলে, আমি?

ডাক্তার বলেন, হ্যাঁ।

সেঁজুতিকে বাইরে বসিয়ে শিশির আবার আসে ডাক্তার সাহেবের সামনে।

ডাক্তার বলেন, শোনেন। ওনার হেপাটাইটিস সি।

শিশির বলে, মানে?

খুব খারাপ একটা ভাইরাস। আর আগে ধরতে পারলেও হতো। এখন তো বেশ এডভান্সড স্টেজ।

মানে কী?

মানে...ওনার অসুখটা ভালো নয়। আর ভাইরাসের চিকিৎসা তো বেশি নাই। যাই হোক, আপনি ঘাবড়াবেন না। ইনশাল্লাহ ভালো হয়েই যাবেন। উনি ড্রিংসট্রিংস করেন না তো।

মানে?

কোনো নেশাটেশা নাই তো।

কী বলেন। একদম না।

আচ্ছা আচ্ছা। না মানে অ্যালকোহল একদম হারাম। আর বেছে খেতে হবে।

শিশির বলে, অসুখটা কি ছোঁয়াচে।

হুঁ। তবে ব্লাডের মাধ্যমে বেশি ছড়ায়। উনি হয়তো কারো কাছ থেকে ব্লাড নিয়েছিলেন। বা অনেক সময় একই সুচ ইউজ করলে হয়। মেয়েদের তো আবার কান ফুটা করাটরার ব্যাপার থাকে। একই সুচ দিয়ে হয়তো ৫ জনের কান ফুটা করেছে। নানাভাবে এই রোগ ছড়াতে পারে।

শিশির বলে, আর ও যদি কাউকে ব্লাড দিয়ে থাকে...

ডাক্তার বলেন, তাহলে তাদেরও হতে পারে...

ও তো অনেককে ব্লাড দিয়েছে। বহুজনকে। ব্লাড দেওয়া ওর একটা হ্যাবিট ছিল। খুব ভালো মেয়ে তো।

ব্লাড তো স্ক্রিনিং না করে আজকাল নেওয়া হয় না। তবে আগে নেওয়া হতো। দেখেন। ওনার ভাইরাস তো মনে হয় পুরানা। যাদেরকে দিয়েছে, তাদেরও উচিত টেস্ট করা। টেস্ট করলে ওরা জানতে পারবেন ওদের কী অবস্থা।

শিশিরের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। এখন কী হবে। এখন?



সেঁজুতিকে ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়েছে। রাশেদুল হাসান সাহেবেরই ক্লিনিক। উনি আশ্বাস দিচ্ছেন, অনেক হেপাটাইটিস সির পেসেন্ট এখন সুস্থ জীবনে ফিরে গেছেন। ইনশাল্লাহ, সেঁজুতিও পারবে।

ডাক্তার সাহেবকে শিশির জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি ওকে জানাব ওর কী অসুখ?

ডাক্তার সাহেব বলেছেন, কেন নয়। জানাতে তো হবেই।

সেঁজুতি জেনে গেছে তার অসুখটা সম্পর্কে। সে বারবার শিশিরকে জিজ্ঞাসা করছিল, আমার কী হয়েছে। শিশির বলেনি। পরে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করে সেঁজুতি জেনে নিয়েছে। তার হেপাটাইটিস সি ভাইরাস।

রত্না দেখতে আসে সেঁজুতিকে। অনেকগুলো ডাব আনে সে। হাসপাতালের লোহার বিছানায় সেঁজুতি শোওয়া। তার পাশে টুলে বসে রত্না।

রত্না বলে, তোর অসুখটা কী?

সেঁজুতি যেন কিছুই হয়নি, এই রকম স্মার্টলি বলে, হেপাটাইটিস সি।

সেটা আবার কী?

সেটা খুব খারাপ একটা ভাইরাস। তুই আমার অতো কাছে আসিস না। তোরও হতে পারে।

যা। হলে হবে। আমি আর তুই না এক বাড়িতে বিয়ে করতে চাইছিলাম। এখন না হয় হাসপাতালের একটা ঘরে পাশাপাশি শুয়ে থাকব।

শুধু হাসপাতালে না। কবরও একটা গর্তে হতে পারে।

কী বলিস?

হ্যাঁরে। অসুখটা ভালো না। আসলে আমাকে মাস ছয়েক আগেই একটা ক্লিনিক বলে দিছল, টেস্ট করান। ডাক্তার দেখান। আমি পাত্তাই দিলাম না। এখন তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তারপর সেঁজুতি চুপ করে যায়।

আর রত্না কাঁদতে শুরু করে।



শিশির ইন্টারনেটে বসে হেপাটাইটিস সি সম্পর্কে পড়াশোনা করছে।

তার অফিসে নিজের ডেস্কেই কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ আছে।

সে যতদূর জানতে পারল, বুঝতে পারল, তাতে হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত মানুষের ৮০ ভাগেরই কোনো লক্ষণ থাকে না। এই জন্যেই সেঁজুতি বুঝতে পারে নি, সে কী ভয়াবহ ভাইরাস বহন করে চলেছে।

তারপর যে লক্ষণগুলো দেখা দেয়, তার মধ্যে আছে–জন্ডিস, ক্লান্তি, পেশাব কালচে হয়ে যাওয়া, পেটে ব্যথা, খিদা কমে যাওয়া আর বমি বমি ভাব।

অনেক দিন ধরে যদি এই ভাইরাস আক্রমণ করে বসে থাকে, তাহলে ক্রনিক ইনফেকশন হয় ৫৫% থেকে ৮৫% ভাগের।

লিভারে ইনফেকশন হয় ৭০ ভাগের।

লিভারের ক্রোনিক অসুখ থেকে মারা যায় ১% থেকে ৫%।

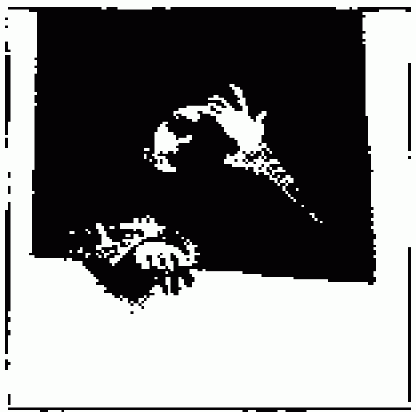
অনেক ক্ষেত্রে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হয়।

হেপাটাইটিস সি আক্রান্তদের হেপাটাইপিস এ আর বি ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

হেপাটাইটিস সি-এর কোনো টিকা নাই।

হেপাটাইটিস সি আক্রান্তদের অন্যকে রক্ত, বা টিস্যু বা শরীরের কোনো অঙ্গ দান করা নিষেধ।

খুব কম ক্ষেত্রেই সেক্সের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। তবু কন্ডম ব্যবহার করা ভালো। এবং সঙ্গীর উচিত হেপাটাইটিস বি ইঞ্জেকশন নিয়ে নেওয়া।



শিশির অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে প্রায়ই। সেঁজুতির ক্লিনিকে যায়।

সেঁজুতির কাছে বসে থাকে। ওকে নানা গল্প শোনায় ।

শিশির ওর জন্যে নতুন একটা এমপি থ্রি প্লেয়ার কিনে নিয়ে আসে। তাতে এক হাজারটা গান ধরে।

সেঁজুতি খুব খুশি হয়।

চিকিৎসা চলছে সেঁজুতির। ডাক্তার আশা করছেন, সেঁজুতি ভালো হয়ে উঠবে। ও সেরে উঠবে। যে ৫ ভাগ রোগী মৃত্যুবরণ করে এই রোগে, সেঁজুতি তাদের দলে পড়বে না, শিশির ভাবে।

শিশির ইদানীং খুব ধর্মভীরুও হয়ে উঠেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরু করেছে সে। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের শেষে সে সেঁজুতির জন্যে দোয়া করে।

আল্লাহতালার উদ্দেশে বলে, হে আল্লাহ, এই মেয়েটা একটা অসাধারণ মেয়ে। হাসিখুশি মেয়ে। পরোপকারী মেয়ে। অন্যের ভালোর জন্যে যে নিজের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে এসেছে বছরের পর বছর, বিভিন্ন অজানা মানুষকে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে। মানুষের রোগমুক্তির জন্যে।

শিশিরের মনে পড়ে, সেঁজুতির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের দিনটার কথা।

ফেব্রুয়ারি মাস। বাংলা একাডেমির বইমেলা জমে উঠেছে। শিশির বইমেলায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্টলে কর্মী হিসাবে কাজ করছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বেরিয়ে শিশির আর কোনো কাজ না খুঁজে সরাসরি চলে এসেছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে।

এখানে কাজ করলে টাকাপয়সা তেমন মেলে না, কিন্তু আনন্দ পাওয়া যায় ঢের।

প্রতিদিন দুটোর মধ্যে বইমেলায় এসে সে অন্য কর্মীদের সঙ্গে স্টল খোলে। স্টিলের ট্রাংক থেকে বই নামিয়ে সাজিয়ে রাখে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই বিক্রি করে। সেসবের আবার হিসাব রাখতে হয়।

কত ধরনের মানুষই না আসে বইমেলায়। কেউ আসে কিনতে। কেউ আসে শুধুই ঘুরতে। বইচোরও ঘোরে দু একটা। দুই একজন পকেটমারও মাঝে-মধ্যে ধরা পড়ে মেলায়।

এরই মধ্যে একদিন একটা শ্যামলা মতো উজ্জ্বল চোখের ছিপছিপে তরুণী আসে মেলায়। সে এসে বই নাড়ে চাড়ে। শেষে কেনে রম্যরচনার দুটো সংকলন।

মেয়েটা জিজ্ঞেস করে, বই দুটো পড়লে হাসি আসবে তো। বলেই সে হাসতে থাকে।

শিশির বলে, আপনি বই হাতে নিয়েই যত হাসছেন। বই পড়লে না জানি গম্ভীর হয়ে যান। তারপর মেয়েটি ৫০০ টাকার একটা নোট দিয়ে আরও বই খুঁজতে থাকে।

মুজতবা আলীর একটা সংকলনও কেনে সে।

তারপর বইগুলো প্যাকেটে নিয়ে চলে যায়।

শিশির হিসাব করে যখন বাকি টাকা হাতে নিয়ে মাথা তুলে তাকিয়েছে, দেখে মেয়েটা আর নাই।

সেই টাকাটা সে তুলে রাখে আলাদা করে।

অনেকদিন পরে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয় আবারও। একটা বাসে।

শিশির তার মুখটা আজও ভোলেনি।

শিশির মেয়েটার পাশে বাসের হাতল ধরে দাঁড়ায়। তারপর বলে, আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কাজ করি। আপনি কি বইমেলায় আমাদের স্টল থেকে দুটো রম্যরচনার বই আরেকটা মুজতবা আলী কিনেছিলেন!

হ্যাঁ। কেন।

আপনার ৩৪০ টাকা পাওনা আছে। আপনি একটা ৫০০ টাকার নোট দিয়েছিলেন। তারপর আর না নিয়েই চলে গেছেন।

ও হ্যাঁ। আমি পরে দেখি হিসাব মেলে না কেন।

আপনার টাকাটা আমি পৌঁছে দেব। এখন এত টাকা আমার পকেটে নাই। আমি কেন্দ্রের একটা ড্রয়ারে আলাদা করে টাকাটা রেখে দিছি। আপনি বলেন, টাকাটা আমি কোথায় পৌঁছাব।

আপনি কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে বসেন?

না লাইব্রেরিতে না। নিচে আড্ডা দেই। ছাদেও দেই। এটা ওটা কাজ করি। সামনে তো আবার বইপড়া কর্মসূচি শুরু হচ্ছে।

আচ্ছা আপনাকে ৬টার দিকে গেলে কেন্দ্রে পাওয়া যাবে?

যাবে।

আপনার নাম কী?

শিশির। মনে রাখতে না পারলে মনে রাখবেন শিশি বোতল। আপনি যদি গিয়া বলেন শিশিভাই আছে, লোকে কিন্তু ভাববে শিশিরই বলছেন। তাই না।

সেঁজুতি আবার হাসতে থাকে।

আপনার নাম বলেন। কী বললে বুঝব আপনি আসছেন?

আমার নাম সেঁজুতি। এইটা কীভাবে মনে রাখবেন?

এমনি মনে থাকবে। সেঁজুতি মানে প্রদীপ তো। ওইটা আমার মনে থাকবে।

আচ্ছা আমি কালকে তো শনিবার, কালকে আমার কাজের পরে যাব।

পরের দিন সেঁজুতি আসে না। শিশির বেশ একটা অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে সময় কাটায়। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা না এলে তার মনটা দমে যায়।

কিন্তু সেঁজুতি তার পরের দিন আসে।

এসেই বলে, শিশি দা, কী অবস্থা আমার। কই টাকা দেন?

শিশির বলে, বসেন বসেন। দিচ্ছি। এক কাপ চা খান। তারপর দেব।

টাকাটা পেয়ে সে বলে, ভাইয়া, আমাকে কেন্দ্রের মেম্বার করে নেন। যাতে আমি এখান থেকে বই ধার নিয়ে গিয়ে পড়ে পড়ে ফেরৎ দিতে পারি।

মহাউৎসাহে শিশির তাকে মেম্বার করে নেয়। আর তাকে দুটো বই ধার দেয়।

এই শুরু।

মাঝে-মধ্যে সেঁজুতি আসে। ওরা কেন্দ্রের ছাদে বসে গল্প করে। আড্ডা দেয়।

শিশির আস্তে আস্তে জানতে পারে সেঁজুতির জীবনের দুঃখ।

তার বাবা মা আর ছোট একটা ভাই আছে। ওরা থাকে আমেরিকায়। বাবা একজন ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলেন। আমেরিকায় একটা ব্যাংকারদের সম্মেলনে বাবা দাওয়াত পান।

তখন পুরো পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা যদি ভিসা পায়, আমেরিকা চলে যাবে।

কিন্তু সেঁজুতির তখন সামনে এসএসসি পরীক্ষা। সে বলে, সে যাবে না। তোমরা যাও। আমি পরে যাব।

বাবা, মা, আর ছোট্ট ভাই সেজান ভিসা পেয়ে যায়। তারা চলে যায় আমেরিকা। থাকে নিউ ইয়র্কে।

পরীক্ষার পরে সেঁজুতি আবেদন করে ভিসার জন্যে।

তাকে ভিসা দেওয়া হয় না।

৯টা বছর সেঁজুতি তার বাবা-মা-ভাইকে ছাড়াই এই দেশে আছে। তাদের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দিতে।

কুমিল্লায় সেঁজুতি তার মামার বাসায় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর সে ঢাকার বদরুন্নেসা কলেজের হোস্টেলে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। পাস করে ভর্তি হয় সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে।

প্রথম প্রথম সেঁজুতি অনেক কান্নাকাটি করত। কেন বাবা-মা তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তার খুব মনে পড়ত ছোট ভাই সেজানের কথা।

কিন্তু এখন সে মন শক্ত করে ফেলেছে। এখন আর সে কাঁদে না। সে আর কোনোদিন আমেরিকা যাবেও না।

ওদিকে বাবা-মারও আমেরিকার কাগজপত্র এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তারাও একটি বারের জন্যে মেয়েকে দেখতে দেশে আসতে পারেন না।

এই মেয়েটার একটা সাংঘাতিক গুণ আছে। সে রক্ত দান করতে ভালোবাসে। কী জানি, বাবা-মার স্বার্থপরতার জবাব দেবার জন্যেই কিনা কে জানে, রক্ত দান করা তার হবি।

এই রকম একটা মেয়েকে কি ভালো না বেসে উপায় আছে।

আর শিশির?

শিশিরকে কেন ভালোবাসতে গেল সেঁজুতি।

শিশিরের একটা গুণ হলো সে বই ভালোবাসে। গান ভালোবাসে। চলচ্চিত্র ভালোবাসে।

সেঁজুতি হয়তো এইসব কারণে একাত্মতা অনুভব করেছে। আর শিশিরের সেন্স অফ হিউমার সাংঘাতিক। সে প্রত্যেকটা কথায় হাসাতে পারে।

আর শিশিরও যে জাহাঙ্গীর নগরের অ্যানথ্রপলজি থেকে পড়াশুনা করে এসে চাকরি-বাকরি না খুঁজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সেটাও হয় তো খানিকটা মুগ্ধ করে থাকবে সেঁজুতিকে।

এইভাবে একদিন ওদের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়।

সেটা অবশ্য প্রথম প্রকাশ পায় এক ভ্যালেন্টাইন'স ডে-তে।

সেঁজুতি বলে রেখেছিল, শিশির কালকে তুমি কী করছ?

কী আর করব। বইমেলায় স্টলে থাকব।

না কালকে তুমি ছুটি নাও। কালকে আমরা এক সঙ্গে ঘুরব।

কেন! কালকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস ডে। বইমেলায় বেজায় ভিড় হবে। স্টলে লোক বেশি লাগবে।

লাগলে লাগবে। তুমি আমার সঙ্গে ঘুরবা।

তোমার কাজ?

আমি কালকে কাজে যাব না।

পরের দিন সকাল সকাল শাড়ি পরে সেজেগুজে সেঁজুতি চলে আসে কেন্দ্রে। শিশির তখনও আসেনি।

শিশির যথারীতি ভাঙাচোরা ধরনের জিন্সের প্যান্টের ওপরে একটা মলিন ফতুয়া পরে আসে, খানিকক্ষণ পরে।

সেঁজুতি বলে, শিশি বোতল ভাই, আপনার আসতে এত দেরি লাগলে চলবে।

চলেন বের হই।

কই যাব।

রিকশায় করে ঘুরব।

কেন?

তোমার সাথে কালকে কী কথা হলো।

ওরা বাংলামোটরে গিয়ে একটা রিকশাভাড়া করে। ঘন্টা হিসাবে। এক ঘন্টা চল্লিশ টাকা। সেই রিকশায় ওঠার পর সেঁজুতি তার ঝোলা থেকে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল আর একটা কার্ড বার করে।

বলে, নাও। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে।

কার্ডটাতে ইংরাজিতে ভালোবাসার নানা কথা।

আর লেখা শিশিবোতল সাহেবকে সন্ধ্যা প্রদীপ।

শিশিরের পুরা শরীর রোমাঞ্চিত।

সে ফট করে সেঁজুতির ঠোঁটে চুমু দিয়ে বসে।



সেঁজুতি ক্লিনিকের বিছানায় একা শুয়ে আছে। শুয়ে থাকতেই থাকতেই হঠাৎ তার একটা কথা মনে হয়। তার রক্তে যদি হেপাটাইটিস সি থাকে, তাহলে সে যাদের ব্লাড দিয়েছে তাদের কী অবস্থা। ভাবতেই সে ভয় পেয়ে যায়। তার পেটের ভেতর গুড়গুড় করা শুরু করে।

সে উঠে বসে। সে যাদের রক্ত দিয়েছিল, তাদের অনেকের নাম্বার তার মোবাইলের বুকে সেভ করা আছে।

সে ফোন করে শান্তর মার মোবাইলে।

হ্যালো। শান্তর মার গলা।

সেঁজুতি বলে, হ্যালো শান্তর মা আপা বলছেন।

শান্তর মা বলেন, হ্যাঁ। সেঁজুতি বলো।

আপা। একটু শান্তর ব্লাডটা টেস্ট করাবেন।

কেন বলো তো।

দেখেন তো ওর হেপাটাইটিস সি আছে কিনা।

কেন তোমার মনে হচ্ছে ওর হেপাটাইটিস সি হইতে পারে।

আপা, আমার নিজের তো হেপাটাইটিস সি ধরা পড়ছে। প্লিজ টেস্ট করাবেন। প্লিজ...

এরপর সেঁজুতি ফোন করে রত্নার দুলাভাইকে।

হ্যালো, শ্যালিকা, কী খবর। তুমি তো ফোন করোই না। দুলাভাই রসিকতার ছলে বলেন।

সেঁজুতি বলে, দুলাভাই। একদিন দেখতেও তো আসলেন না। শোনেন দুলাভাই আপনি একটু আপনার ব্লাডটা টেস্ট করাবেন...আপনার হেপাটাইটিস সি আছে কিনা...

আরে কী বলো না বলো। আমার এইসব হবে-টবে না। ডেংগু হলে আর কিছুই তাকে কাহিল করতে পারে না।

প্লিজ দুলাভাই। আমি সিরিয়াস। করান টেস্ট।

সেঁজুতি তার মোবাইলে যতজন রক্তগ্রহীতার নাম্বার ছিল, সবাইকে ফোন করে।

ওকে দেখতে এসেছিল ওদের এবি নেগেটিভ ক্লাবের মেম্বার ডা. ইকবাল। সেঁজুতি তাকে অনুরোধ করে, ইকবাল ভাই, একটা কাজ করেন না, আমি যাদের রক্ত দিয়েছি, তাদের সবাইকে আপনি একটু ফোন করে খোঁজ নেন না ওদের কার কী অবস্থা।



তারপর একে একে সেঁজুতির কাছে আসতে থাকে ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদগুলো।

শান্তর মা ফোনে কাঁদছেন।

সেঁজুতি, এ কী হলো বোন। আমার ছেলের ব্লাডে তো হেপাটাইটিটিস সি পজিটিভ এসেছে।

সেঁজুতিও কাঁদে, আপা। আমি স্যরি আপা। ওই হাসপাতাল তো আমার স্যাম্পল নিয়ে ম্যাচ করাল। ওদের যদি ব্লাড স্ক্রিনিংয়ের প্রভিশন থাকত; তাহলেই তো টেস্টেই ধরা পড়ত। তাহলে তো আমার রক্ত ওরা নিত না। আপনার ফুটফুটে চালাক ছেলেটা। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়। সেঁজুতি কাঁদতে শুরু করে। আপা, আমাকে মেরে ফেলেন আপা। আমার জন্যে আপনার ছেলেটার আজকে এই অবস্থা।

না বোন তোমাকে আমি দোষ দেই না। তুমি তো উপকার করতে আসছিলা তাই না। সত্যি, হাসপাতালঅ্যালারা ব্লাড নেওয়ার আগে টেস্ট করাবে না? এখন কী হবে সেঁজুতি?

জানি না। আপনারা ডাক্তার দেখান। ওর চিকিৎসা শুরু করেন। আমি দোয়া করি, আল্লাহ আমাকে তুলে নিক। তবু যেন শান্তকে বাঁচিয়ে রাখে। সুস্থ রাখে।

তারপর ফোন আসে রত্নার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে।

মোবাইলে তার নাম উঠতেই সেঁজুতি বলে, দুলাভাই। কী খবর?

দুলাভাই কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ কেন করলা? হেপাটাইটিস সি হলে মানুষ বাঁচে না তুমি জানো...

দুলাভাই। আমার তো এডভান্সড স্টেজ। আপনার তো এখনও জন্ডিস হয়নি। আপনি ট্রিটমেন্ট শুরু করেন। আপনি বাঁচবেন।

শয়তান মেয়ে। ডাকিনি মেয়ে। কেন তুমি এত বড় সর্বনাশ করলা।

দুলাভাই আমি ইচ্ছা করে করিনি। আমি তো বলি নাই আমি ব্লাড দিতে চাই। আপনি নেবেন কিনা। এ পর্যন্ত আমি ৮/৯জনকে ব্লাড দিছি। আমি জানতাম না... দুলাভাই আমি জানতাম না... কান্নায় ভেঙে পড়ে সেঁজুতি।

তারপর আরো আরো ফোন আসে তার কাছে।

সেঁজুতি ধরে, বলে, আপনার মায়ের টেস্ট করাইছেন। করাইছেন। কী আসছে। পজিটিভ, হায় খোদা। আরো একজন গেল।

ফোন রেখে সেঁজুতি হায় হায় করে কাঁদে। মাথা চাপড়ায়। চুল ছেঁড়ে।

ডাক্তার ইকবালের কাছ থেকে আরও আরও রক্তগ্রহীতার খবর পাওয়া যায়।

বেশির ভাগেরই রক্তে হেপাটাইটিস সি পাওয়া গেছে।

সেঁজুতি গম্ভীর হয়ে যায়।

সে আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না।

সেঁজুতি, যে মেয়ে না হেসে কোনো কথা বলতে জানত না, সেই মেয়ের মুখ থেকে হাসি চলে যায়।

ডাক্তার ইকবাল আর সেঁজুতি বসে হিসাব কষতে, কোন কোন গ্রহীতার রক্তে হেপাটাইটিস সি গেছে, আর কোন কোন গ্রহীতারটার যায় নাই।

আবদুল খালেকের হয় নাই। তার আগের দুইজনের হয় নাই। বাকি ছয়জনের হয়েছে।

আবদুল খালেককে রক্ত দেবার পরে কী ঘটেছে যে সেঁজুতির রক্তের মধ্যে এইচসিভি ঢুকে গেল।

তখন তার মনে পড়ে, তার একবার খুব দাঁতে ব্যথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই দাঁতে রুট ক্যানাল করতে হয়। সেটা সে করেছিল সিলেটের একটা ডেন্টিস্টের কাছে।

ওই ডেন্টাল ক্লিনিকের যন্ত্রপাতি সম্ভবত জীবাণুমুক্ত করা হয় নাই ঠিকমতো। বা তারা যে পানি ব্যবহার করত, তাতে কোনো সমস্যা ছিল। সেই রুট ক্যানাল করতে গিয়ে কি ঢুকে গেল তার শরীরে এইচসিভি?

ডা. ইকবাল বলেন, হ্যাঁ হতে পারে। হতে তো পারেই।

আচ্ছা ইকবাল ভাই, আর কী কী ভাবে এইচসিভি ছড়ায়? এ সম্পর্কে আপনি কী জানেন আমাকে জানান তো।

আচ্ছা আমি তোমাকে একটা আর্টিকেল ফটোকপি করে এনে দিব।

আর্টিকেল ফটোকপি করে দিতে হয় না।

হসপিটাল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক রুমে রোজ একটা করে দৈনিক পত্রিকা দেয়। একদিন তারই স্বাস্থ্য পাতায় ছাপা হয় কী কী ভাবে এই জীবাণু ছড়ায়, কীভাবে ছড়ায় না।

এই আর্টিকেলটা পড়ে সেঁজুতি অনেক কিছু জানতে পারে।

মায়ের পেটের শিশুরও এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। ২০ জনে একটা শিশুর মধ্যে এটা চলে আসে।

স্বামীর শরীরেও এটা যেতে পারে। যদিও আদৌ যায় কিনা, কন্ডম ব্যবহার করলে এই রোগের বিস্তার ঠেকানো যায় কিনা, পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি।

সেঁজুতির মামা ভাগ্নির অসুখের খবর জানতে পেরেছেন। তিনি এসে দেখা করে গেছেন ভাগ্নির সঙ্গে। সেঁজুতি বলেছে, বাবা মাকে এই খবরটা দেওয়ার দরকার নাই। অযথা টেনশন করবে। তারা সুখে আছে সুখে থাকুক। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার দরকার কী?

শিশিরের সঙ্গেও সেঁজুতি খুব খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

সেঁজুতি বলে, শোনো শিশির। তুমি আর আসবা না।

কেন?

অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা?

আমার আর তোমাকে ভালো লাগে না।

আমার তোমাকে ভালো লাগে।

আলগা দরদ দেখাতে আসবা না। আমি কারো আলগা দরদ চাই না। চাইলে আমি আমার মা বাবার কাছে আমেরিকা চলে যাওয়ার জন্যেই চেষ্টা করতাম।

আমি আলগা দরদ দেখাচ্ছি না। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি। আমি আসবই।

আমার ভালোবাসার দরকার নাই।

আমার আছে।

তুমি আমাকে ভালোবাসতা, যখন আমার শরীর এইচসিভি ছিল না। যখন আমি সুস্থ ছিলাম। এখন এই রকম একটা ডিজিজ, যেইটার কোনো টিকা ফিকা নাই, সেইটা আমার আছে, সেইটা নিয়া আমি কাউকে আমার পাশে দেখতে চাই না। তুমি যাও। সেঁজুতি চিৎকার করে ওঠে।

সেঁজুতি প্লিজ, এইটা হসপিটাল। চিল্লাচিল্লি কোরো না। প্লিজ।

না। তুমি আমার কাছে আসবা না। তুমি আমাকে ছেড়ে যাও। তুমি অনেক মেয়ে পাবা। অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে। তাদের কাউকে বিয়ে করে তুমি সুখি হও।

প্লিজ সেঁজুতি, প্লিজ একটু চুপ করো। শিশির সেঁজুতির হাত ধরে মিনতি করে বলে।

সেঁজুতির চেহারা খেপাটে দেখায়, সে ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তুমি যাও। না গেলে আমি সব কিছু ছুড়েটুড়ে ভেঙে ফেলব।

আচ্ছা আমি আপাতত যাচ্ছি। তুমি শান্ত হও। পরে আমি আবার আসব।

না তুমি আর আসবা না।



সেঁজুতি ঘুমিয়ে পড়লে শিশির আবার আসে।

সেঁজুতির পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

তার ঘুম আসে না।

কী আনন্দের জীবনটাই না ছিল দুইজনের।

তারা একটা বাসাভাড়া নিয়েছে। এখন দুজনে মিলে সাজানোর কথা।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল।

চিকিৎসার পেছনেই কত টাকা চলে যাচ্ছে।

সেঁজুতিই কিছু টাকা জমিয়েছিল ৬ মাসের বেতন থেকে। সে আর কত?

অবশ্য তাদের অফিস থেকে এসে খোঁজ-খবর করছে। হেলথ ইনসুরেন্স নাকি করা আছে। কিছু টাকা ইন্সুরেন্স থেকেও পাওয়া যাবে।

টাকাটা চিন্তা না। আসল কথা ভালো হলেই হয়।

আজকাল ভালোও নাকি হয়।

ইন্টারফেরন আর রিবাভিরিনি এক সঙ্গে দিয়ে দেখছেন ডাক্তার। এমনও হতে পারে, সেঁজুতি সেরে উঠবে।

তবে লিভার ইনফেক্টেড হয়ে গেছে, সেইখানেই ডাক্তারের ভয়।

নানা কিছু কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশির।



সেঁজুতির ঘুম ভেঙে যায়।

সে খুব মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখছিল। সে দেখছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। শিশিরকে নতুন একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে। তারা যাচ্ছে ফিরানিতে। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে। তার বাবা-মা আর সেজান ওই বাসাতেই আছে, আগে যেমন থাকতেন।

বাবা একটা মোটর সাইকেল চালিয়ে ব্যাংক থেকে আসেন।

শিশির আর সেঁজুতিকে দেখে সেজান দৌড়ে আসে। আপা আসছে দুলাভাই আসছে বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছে সে।

আশ্চর্য সেজান এখনও ক্লাস সেভেনের সেজানই রয়ে গেছে। মাঝখান থেকে যে ১০টা বছর চলে গেছে, সেজানের বেলাতে তার কোনো প্রমাণ নাই!

মা এলেন আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে। সেজু আইছস। আয় আয়। কী আশ্চর্য, জামাই নিয়া আইছস, আমারে আগেভাগে খবর দিবি না।

শিশিরের দুই হাতে মিষ্টির প্যাকেট। সেগুলো হাতে নিয়ে সে মাকে কদমবুসি করতে পারছে না।

তাই দেখে সেঁজুতি খুব হাসছে।

হাসতে হাসতেই ঘুম ভেঙে যায়।

আমি এখন কোথায়?

সেঁজুতি ভাবে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। নাকে এসে লাগছে ফিনাইলের গন্ধ। হাতের মধ্যে স্যালাইনের সুচ। সেঁজুতি বুঝতে পারে সে হাসপাতালে।

আমি হাসপাতালে। লিভারের সমস্যায় ভুগছি। আমি হয়তো আর ভালো হবো না।

হলেও মানুষের জীবনে বোঝা হয়েই থাকব।

সেটা কোনো ব্যাপার না।

তার চেয়েও বড় কথা, সে অনেকের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে এই বিষ।

শান্ত ছেলেটার কথা তার মনে পড়ে। ও এখন কত বড় হয়েছে। কী পাকা পাকা কথা বলত ছেলেটা। আহা কি বুদ্ধিমান ছেলে। তার শরীরেও এইচসিভি।

আমি তার শরীরে এই জীবাণু ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি একটা সুন্দর নিষ্পাপ বুদ্ধিমান সপ্রতিভ শিশুর সমস্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছি। সে ভাবে।

তার ব্রহ্মতালু তপ্ত হঠে।

সেঁজুতি বিছানা ছাড়ে। স্যালাইনের নলে রক্ত উঠে আসে। সে স্যালাইনের সূঁচ খুলে ফেলে।

আস্তে করে কেবিনের বাইরে যায়। টুক করে দরজায় একটা শব্দ হয়।

হাসপাতালের ছাদের দিকে যাওয়ার জন্যে সে সিঁড়ি খোঁজে।

শিশিরের ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখে সেঁজুতি বিছানায় নাই। সে বাথরুমে যায়। দেখে দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নাই।

সে তাড়াতাড়ি করে আবার কেবিনের দরজার দিকে তাকায়।

ওই দরজা খোলা কেন?

শিশির দৌড়ে বাইরে আসে।

হাসপাতালের বারান্দার ছাদে জ্বলা লাইটের আলোয় সে দেখতে পায় ওই যে সেঁজুতি। সে সিঁড়ি বেয়ে কোথায় যায়।

শিশির তার পিছু নেয়।

সেঁজুতিও দৌড়াতে থাকে। একটার পর একটা সিঁড়ি।

সেঁজুতি ছাদের দরজা খুঁজে পায়।

শিশির তাকে ধরে ফেলে।

কী করো সেঁজুতি, শিশির বলে।

সেঁজুতি গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিশিরের হাতের বন্ধন থেকে মুক্তি হতে চায়।

সেঁজুতি বলে, শিশির আমাকে ছাড়ো। আমাকে ছাড়ো.... আমি পাপী। আমি খুনী। আমি সাতটা আটটা জীবন চিরতরে শেষ করে দিছি। আমি সবাইকে খুন করছি....

তুমি কেন খুন করতে যাবা?

শিশির। তুমি তো শান্ত ছেলেটাকে চেনো। কী সুন্দর করে কথা বলে। আমাকে বিয়ে করতে চায়। ওই ছোট্ট নিষ্পাপ ছেলেটার শরীরে আমি বিষ দিয়েছি।

সেঁজুতি তুমি শান্ত হও তো!

ও ও মারা যাবে। আমার মৃত্যু নিয়ে আমি ভাবি না শিশির। আমি যে এতগুলো মানুষকে মারলাম তার কী হবে বলো তার কী হবে?

শিশির বলে, কারো কিছু হবে না। প্রত্যেকের চিকিৎসা হবে। প্রত্যেকে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকবে। চলো তুমি নিচে...

হৈচৈ শুনে নার্সরা ছুটে আসে ছাদে। দারোয়ান আসে। সবাই মিলে জোর করে সেঁজুতিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় কেবিনে।

জোর করে ধরে তাকে শুইয়ে দেওয়া হয় বিছানায়। তবু সে হাতপা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে।

তাকে ব্যান্ডেজের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় লোহার বিছানার সঙ্গে। তার হাত বাঁধা হয়। তার পা বাঁধা হয়।

তাকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া হলে সে আস্তে আস্তে তার শরীর নিস্তেজ হতে থাকে।

সে দেখতে পায় শান্ত তার দিকে এগিয়ে আসছে, বলছে, সেঁজুতি, তুমি বড় ভালো মেয়ে, তুমি যাও। আমিও আসছি। আমি তোমাকে বিয়ে করব।

সেঁজুতি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়।



সেঁজুতির যকৃতের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে।

কিন্তু তার মনের সমস্যাটা এখনও মেটে নি। তার যখনই মনে হয়, তার জন্যে এতগুলো মানুষ সংক্রমিত হয়েছে এইচসিভিতে, তখনই তার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়।

এখন তাকে একজন মনোচিকিৎসককে দেখানো হচ্ছে নিয়মিত।

শিশির নিয়মিত সঙ্গ দিচ্ছে সেঁজুতিকে।

শিশিরের বাবা-মা অবশ্য ছেলের জন্যে একটা পাত্রী ঠিক করে রেখেছেন। শিশির এখনও রাজি হয়নি।

বাবা-মা বলছেন, আমরা অবশ্যই নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চাই। তোর ওই মেয়ে কি বাচ্চা নিতে পারবে?

শিশির তাদের কথা পাত্তা দিচ্ছে না।

সে অপেক্ষা করে আছে, সেঁজুতির মাথাটা একটু ঠান্ডা হলেই সে বিয়েটা সেরে ফেলবে।

মনোচিকিৎসক সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন।

শুধু সেঁজুতির মাথাটা ঠান্ডা হতে চাইছে না।

শিশির জানে না, সে এখন কী করবে!